এখন ঢের বেড়ে গেছে।" তারা সব্বাই মিলে আমার নিন্দা কি পশুপতিকে নিয়োগ করবার জন্য বিলেতে কালকার মেলে গি পাঠিয়েছেন। শতদল, বল্ত—এর পরে কি আর কাজ করতে ইচ্ছা হয় তোমার আদর তো আমার পক্ষে গঙ্গাস্নান, এই আদর পেয়েই তো বেঁচে আছি। কিন্তু আমি যে আর বরদাস্ত কর্তে পাচ্ছি না।"

শতদল। "বড় চাকুরীটা না পেলে, তা' কি করবে? তাই বলে পাওয়া জিনিষটা তো ছেড়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।"

যোগেশ। "আমার শতদলপদ্ম, তুমি বুঝ্তে পাচ্ছ না। এর পরে হয়ত আমাকে সামান্য পেন্সন নিয়ে বের হ'তে হবে। এমন কি এ ছুঁতো ও ছুঁতো করে, তা হ'তেও বঞ্চিত করতে পারে, তা যখন ভাটা পড়েছে, কোথায় যে এই অবস্থার শেষ হবে, তাতো বুঝ্তে পাচ্ছি না। আর এই সুদীর্ঘ কালের প্রাণপাত পরিশ্রমের পর যে কুৎসাপূর্ণ চিঠিটা বিলাতে গেল, এই তো আমার কাজের পুরস্কার!

"শতদল আজ দেড় বৎসর হ'ল জন্সন্ চ'লে গেছেন। এই দেড় বৎসর যে কত ছোট বড় অপমান সহ্য করে কাজে আছি, তা আমিই জানি। অবশ্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের পাপের ফলে আমরা এখন এমন একটা অবস্থায় পড়েছি যে, আমাদের সব কষ্ট সইতে হ'বে, মুখ বুজে সইতে হবে। স্ত্রীলোকেরা যেরূপ মার্-ধর, অপমান মিথ্যা অভিযোগ ও গঞ্জনা রোজ রোজ স'য়ে থাকে, তথাপি মুখটি খুলবার সাধ্যি নেই, আমাদেরও সেই দশা হয়েছে। তোমাকে সেদিন পড়িয়ে শুনিয়েছিলাম—সে কাব্যের একটা ছত্র ছিল—"Suffering is the badge of our tribe"—সহ্য করাই আমাদের জাতীয় চিহ্ন। সহিষ্ণু হও, সব সহ্য কর। কেরাণীকুলের যা খাদ্য, ঘোড়া, গরুকেও আমরা তার চাইতে বেশী দিয়ে থাকি। এই সহিষ্ণুতার শেষ নাই। রাজপুত, হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারী, গুজরাটি, আফগান

কত জাতিই তো কল্‌কাতায় আস্‌ছে, কেউ তো কেরাণী হ’তে চায় না। উচ্ছিষ্টের মত যে জিনিষটা অতি হেয় মনে করে সব্বাই ফেলে দিয়েছে, সেইটাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ক’রে বসেছি, কিন্তু এখন আর তা’তে চল্‌বে না। এ মোহ এবার ভাঙ্গবে। যেরূপ দিন কাল পড়েছে, তাতে কেরাণীগিরি ক’রে আর পেট চ’লবে না। আর বিজলী বাতি ও পাখার হাওয়ায় আমাদের জীবিকা সংস্থান হ’বে না, সেখানে কেবল হাওয়া খেতেই হবে।

“যাহোক শতদল, আমি মনে মনে যা ঠিক করেছি, তা এখনও বল্‌ব না। আমি জন্‌সন্‌ সাহেবকে চিঠি লিখেছি, তার উত্তরের প্রতীক্ষায় আছি। তার পরে তোমাকে জানা’ব।”

শতদল—“যাই কর; মুহূর্ত্তের ঝোঁকে ক’র না, শেষে যেন দুর্ব্বুদ্ধিতার কাজ করেছি ব’লে মাথায় হাত দিয়ে অনুতাপ না কর্‌তে হয়। শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াবে, তা ভেবে সিদ্ধান্ত কো’র। তুমি যদি ছেলেপেলে নিয়ে অন্নাভাবে কষ্ট পাও, তবে আমি ছেলেদের ভাত দিতে না পারার কষ্টের চাইতেও তোমার মলিন মুখের কথা ভেবে বেশী অবসন্ন ও দুঃখার্ত্ত হ’য়ে পড়ব। আমি আর কি বলব?”

যোগেশ। “তুমি আর কি বল্‌বে? এ কথা ফিরিয়ে ন্যাও, আমার শতদল পদ্ম—তোমার কথায় যে আমি হাতে বাঘ মারতে পারি, তা’ তুমি জান? তোমার ঐ কোমল বাহুদুটির কত বল, তা তুমি জাননা। আমার যদি ঐরাবতের মত শক্তি থাকে, আর সত্যি সত্যিই যদি তোমার বাহু দুটি লতার মতই দুর্ব্বল হয়, তবুও সেই ঐরাবতকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারে তোমার ঐ দুইটি হাত। তুমি আমার মলিন মুখকে গ্রাহ্য কো’র না। তুমি আমাকে সৎপথে, আত্মমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে উৎসাহ দাও, তা হ’লে বুঝ্‌বে—আমার শক্তি কতটা। তুমি নিজে ভয় পেয়ে আমাকে

সঙ্গে সঙ্গে তীরু ক'রে তুল না। আমি তোমার শুকনো মুখ ও
জলকে ভয় করি, দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝ্তে কিছু মাত্র ভয় করি না, ও
আত্মসম্মান বোধ যিনি দিয়েছেন, তাঁহার বোধ হয় এটা অভিপ্রেত
সেই গর্ব্বটা বিলিতি বেনের বুট-লাঞ্ছিত পথের ধূলা-কাদায় বি
দেই। ভগবানের রাজ্যে বাস করছি,—ফ্রেঞ্চ সাহেব আমার হর্ত্তা,
বিধাতা,'এই মনে ক'রে যেন ভগবানের অধিকার অমান্য না করি।
সাহস দিলেই আমার সৎসাহস শতগুণ বাড়বে, শতদল তুমি তাই
দিও, আর কিছু চাই না। আমায় দমিয়ে দিও না।"

8

শতদলবাসিনী দেবী ছিলেন রঘুপুরের বিখ্যাত জমিদার রজনী চৌ
মেয়ে। ধার্ম্মিক, প্রজাবৎসল ও দাতা ব'লে রজনীবাবুর নাম দেশ
ছিল। তাঁর জমিদারীর আয় বৎসর প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা ছি
তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজীব চৌধুরী এম, এ পাশ করে জমিদারী দেখ্তে
আর দুই পুত্র কলিকাতায় বোর্ডিংএ থেকে পড়্তেন। রাজীব যা
উচ্চ-শিক্ষা পেয়েছিলেন, তথাপি তাঁহার প্রকৃতিটি ছিল পিতার উল্টে
তিনি কড়া মেজাজের লোক ছিলেন এবং একদিকে যেমন ব্যয়
ছিলেন, অপর দিকে তেমনি প্রাচীন সমাজের বিদ্বেষী ছিলেন; তথা
বহুপুরুষের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর দেবতার পূজা অর্চ্চা উঠিয়ে দিতে পারে
নাই। ছোট দুই ভ্রাতা নরেশ ও সুরেশ বিদেশে থাকৃতেন, তাঁরা ব
ভাইএর প্রতাপে "দিবা প্রদীপবৎ" একবারে মলিন হইয়া থাক্তেন—
ফুটতে পার্তেন না।

শতদলবাসিনী তিনটি ভাইএর মধ্যে এক বোন, তিনি শৈশবে খু

আদরে প্রতিপালিত হয়েছিলেন, এজন্য তাঁর প্রকৃতিটি একটু আবদারে-হয়েছিল। যদিও যোগেশ বাবুর যখন পঞ্চাশ টাকা মাত্র বেতন, তখন রাজীববাবু তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করেন, তথাপি শতদলের কখনই অর্থকষ্ট হয়নি। তাঁর মাতা পিতা তাহাকে সর্ব্বদা টাকা পাঠাতেন। দুই বৎসর হল, শতদলের মাতা মারা গিয়েছেন এবং পিতা বৃন্দাবনবাসী হয়েছেন। এই দুই বৎসরের মধ্যে শতদলকে তাঁর ভ্রাতা রাজীব চৌধুরী কোন আনুকূল্য করেন নি। যোগেশ বাবু তেনাই গ্রামের 'গণ' বংশীয়, রাজীব চৌধুরী তেনাই সন্নিহিত রঘুপুরবাসী 'দত্ত'। সতীশের কৌলিন্য-গৌরবে আকৃষ্ট হ'য়ে—বিশেষ তাঁর চেহারাটি ভাল দেখে রাজীব বাবু তাঁকে জামাতারূপে গ্রহণ করেছিলেন।

চিরকাল সুখে প্রতিপালিত হওয়ার দরুণ শতদল কতকটা বিলাসী ও একগুঁয়ে হ'য়ে উঠেছিলেন। তিনি স্বামীকে খুব ভালবাস্‌তেন সত্য, কিন্তু স্বামী তাঁর মুঠোর ভিতর ছিলেন, এজন্যই এই ভালবাসাটা বেশী হয়েছিল। যোগেশ সাহেবদের দৌরাত্ম্য স'য়েও যে কাজ কচ্ছিলেন, সে কেবল শতদলের ভয়ে। তাঁহার মুখে সকালে সন্ধ্যায় স্নো মাখানো চাই। জবাকুসুম, কুন্তলীন প্রভৃতি তিনি পছন্দ কর্‌তেন না, কালিফর্ণিয়ান-পপি, হাস্‌নাহানা, কাশ্মীরের বোকে প্রভৃতিই তাঁর আদরণীয় ছিল। একটা ছোট আলমারী-ভরা তাঁর বিলাতী সাবান ও এসেন্স ছিল। গহনার মধ্যে তিনি বেশী ভারি সোনার হার-বালা পছন্দ কর্‌তেন না; হ্যামিণ্টনের বাড়ীর অল্প দরের হাল্‌কে রকমের ক্যারেট গোল্ডের গহনা অগ্নিমূল্য মজুরী দিয়ে কিন্‌তেন। বিলাতী পালিশ না হ'লে তিনি কোন কোন গহনা গায় পর্‌তেন না। জহরত কেন্‌বার মত অর্থ তাহাদের ছিল না, তথাপি বিলাতি পালিশের গয়না গুলির মূল্যও সামান্য ছিল না। তা ছাড়া নানারূপ সৌখীন শাড়ী, ওর্না, ব্লাউশ—এগুলি তিনি নিজে কলেজ-

ষ্ট্রীটে গিয়ে পল কোম্পানীর বাড়ী হ'তে কিনে আন্‌তেন,—কখন কখনও র‍্যাঙ্কিনের বাড়ীতে অর্ডার যে'ত। পম্প শূ পায় দিয়ে তিনি কখনও কখনও নিজে হগ সাহেবের মার্কেটে গিয়ে বাজার কর্‌তেন। দাস দাসীর সংখ্যাও অতিরিক্ত ছিল। এইভাবে এত কাল যদিও পিত্রালয় হ'তে টাকা এনে খরচ কর্‌তেন এবং স্বামীর আয়ও একরূপ মন্দ ছিল না, তথাপি এই পরিবারে কিছুই জমা হ'ত না, পরন্তু বৎসারন্তে চেঞ্জে যাওয়ায় সময় হাতের টাকা নিঃশেষ হ'য়ে কোন বছর কিছু ধার হ'ত।

পূর্ব্বেই লেখা হয়েছে যোগেশের এক পুত্র মারা গেছে; জ্যেষ্ঠপুত্র বিপিন ম্যাট্রিক এবার পাশ করেছে। কন্যা দুটি; সুন্দরীর বয়স এগার ও রজনীগন্ধা সবে তিন বছরের। বিপিন সি, আর দাসের পেছন পেছন ঘোরে—কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন বা অসহযোগ-নীতির প্ররোচনায় নহে। সে তাঁর বাড়ীতে প্রায়ই গণেশের কীর্ত্তন শুনতে যায়; তাঁদের মানিকতলার বাড়ীর কাছে নন্দদুলাল গোস্বামী থাকেন, তাঁর কাছে সে ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত রীতিমত পরিশ্রম ক'রে পড়েছে। বিপিন খদ্দর পরে, কখনও চটি জুতো পায় কখনও শুধু পায় সহরে হেটে বেড়ায়, নিতান্ত ক্লান্ত না হ'লে ট্রামে চড়ে না। এবং বাড়ীতে তার জন্য যে সকল খাবার তৈরী থাকে, তা না খেয়ে ক্ষুধা পেলে এক পয়সার মুড়ি কিনে খায়। সে ছোট্ট রঘুনাথ দাসের বৈরাগ্য ও প্রেমের কথা সজল চোখে পড়ে পড়ে তাঁকেই আদর্শ করে ঠাওরিয়ে নিয়েছে। মহাপ্রভুর যে উপদেশ আছে, "ভাল না খাইবে,আর ভাল না পরিবে"—তাই সে শিরোধার্য্য ক'রে নিয়েছে। এই খদ্দর পরা ও মুড়ি দিয়ে জলযোগ রাজনৈতিক কোন প্রেরণার ফল নহে—মহাপ্রভুর উপদেশের সাড়া দিয়ে সে বিলাসকে একবারে তার অন্তঃকরণের চতুঃসীমা হতে বের ক'রে দিয়েছে।

মায়ের সঙ্গে ছেলের আদর্শ, মত ও প্রবৃত্তির একেবারেই মিল নাই,

তথাপি মায়ের বাৎসল্যের ত্রুটি নাই, ও ছেলেরও মাতৃ-ভক্তির অবধি নাই। দুই রাজ্যের দুটি প্রাণী, কিন্তু স্নেহ সমস্ত অসামাঞ্জস্য ঘুচিয়ে দিয়ে তাদিগকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করে রেখেছে। মাতা ভিতরে ভিতরে পুত্রকে শ্রদ্ধা করেন এবং পুত্রও মাতার বিলাসিতা দেখে মনের মধ্যে একটু দুঃখ বোধ করেন। যোগেশবাবু কিন্তু বিপিনকে প্রাণের অপেক্ষাও ভালবাসেন, "ওটি আমার বালগোপাল, ওকে আমি পূজো করি" এই বলে কতবার জ্যেষ্ঠপুত্রকে নিয়ে বন্ধুবান্ধবের কাছে গৌরব করেছেন। যোগেশবাবু যে অবস্থায়ই পড়ুন না কেন,—তিনি নিজে ছিলেন নির্ভীক; যে কোন কষ্ট সহ্য করবার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁর আয়ত-লোচনার ক্রুদ্ধকটাক্ষ ও স্ফুরদধরের ভয়ে তাঁর আত্মা শুকিয়ে উঠত। কামিনী সেনের কবিতায় "শক্তি মরে ভীতির কবলে" দশাটি তাঁর হয়েছিল।

অনেক দিন ধ'রে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বুঝুতে চেষ্টা করলেন্। স্বামীর কষ্টে যে তাঁর প্রাণ বিগলিত না হ'ত—তা নয়, কিন্তু সংসারে হঠাৎ যে একটা প্রবল পরিবর্ত্তন ঘটবে, একেবারে অতটা বিলাসের থেকে দস্তুর মত অন্ন-কষ্ট আরম্ভ হবে—ইহা স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বভাবতঃই ভীতিকর। বিলাসী শতদল এই আশঙ্কা বরদাস্ত ক'রে একবারও তাঁর স্বামীকে বল্‌তে পার্‌লেন না, "ভয় কি? তুমি অপমান কেন সইবে? দারিদ্র্য যদি আসে, তার সঙ্গে যুঝে দেখ্‌ব, আমি তোমার সদুদ্দেশ্যের সহায় আছি, ভয় কোর না।" এই ভাবের কথা শোনবার জন্য যোগেশ প্রায়ই তাঁর স্ত্রীর কাছে যখন তখন আফিসের কথা তুল্‌তেন, কিন্তু শতদল সেই সকল কথায় ম্রিয়মাণ হ'য়ে স্বামীকে কোনরূপে কাজ বজায় রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌তে বল্‌তেন। "সহসা কাজ ছেড়ে দিয়ে বস্‌বে, তার পর সদা গোষ্ঠী ভাতে মর্‌ব!" একদিন যোগেশ বলেছিলেন "তোমার তো বাপের বাড়ী আছে, নিতান্ত বিপদে পড়্‌লে

তুমি কিছুদিন ছেলেদেরে নিয়ে বাপের বাড়ীতে থাক্‌বে, তারপর আম
উপার্জ্জনের একটা ব্যবস্থা হ'লে আবার একত্র হব।" শতদল মুখ ম্ল
ক'রে বল্লেন—"বাবা বৃন্দাবনবাসী হয়েছেন, দাদার ভাব তো তোমার অজা
নেই। যেবার বাবা চলে গেলেন সেই বার তোমার জন্য একখানি কাশ্মী
শাল পাঠিয়ে ছিলেন, এবং ছেলেদের ঢাকাই ধুতি-চাদর দিয়ে গিয়েছিলে
আমীর ভাল বেনারসীখানাও সেই বার পূজোয় তত্ত্ব করেছিলেন, তার প
ভাই এই দুই বৎসরের মধ্যে একবারটি জিজ্ঞাসা করেছেন?

"আমি তাদের কাছে হাত পাততে চাই না, তুমি যদি স্বামী হ'
আমাকে সেই দুর্গতির মধ্যে ফেল্‌তে চাও, তবে আর কি করব? তু
এখন, সাহেব তার চাপরাসী বা পশুপতির কাছে ফিস্ ফিস্ করে কি বল্‌
সেই অপমান সইতে পার্‌ছ না, তার পর যদি বাপের বাড়ী হ'তে আমা
তাড়িয়ে দেয় কিম্বা বিপিনকে গরুর লেজ ঠেলে গাড়ী চালিয়ে জীবি
অর্জ্জন করতে হয়,—তাতে কি খুব সম্মান বাড়'বে।"

এর পরে আর কিছু বল্‌বার নাই, অথচ ফ্রেঞ্চ সাহেবের দৌরা
দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল। একদিন বড় বাবু কি একটা ক
বলতে গিয়েছিলেন, তখন ভ্রূকুঞ্চিত করে সাহেব তাঁকে "নিগার, ষ্টপ" ব
ধমক দিয়েছিলেন। যোগেশের মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু রাগে
বশে তিনি কিছু করবেন না, স্থির করেছিলেন। সুতরাং এবার
কোন উত্তর তাঁর মুখে এল না।

সেই দিন সন্ধ্যার পর তিনি গঙ্গার ধারে এসে আহেরীটোলার ঘা
বসে ব'সে চিন্তা করতে লাগলেন। গঙ্গার ধারের দৃশ্যটি বড় সুন্দর-
নৌকায় নৌকায় দীপ জ্বলে উঠেছে, বড় বড় ষ্টীমার হ'তে সার্চ্চ লাইট সপূ
বিদ্যুতের মত বের হ'য়ে দূর দূরান্তরের পল্লীর বৃক্ষাবলীর মাথায় যেন হঠ
সোনার মুকুট পরিয়ে দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সান্ধ্য-সমীরণে

মৃদুল প্রবাহ শরীর স্পর্শ করে যেন জুড়িয়ে গেল। যোগেশ ভাবছেন—"কি করা যায়! যে রকম ভাব দেখ্‌ছি, তাতে আমায় তাড়াবে,—এর পরে তিনকড়ি দারোয়ান এসে বলবে, 'আপনি উঠুন, বাবু, সাহেবের হুকুম' সেই শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করে বসে থাকব? শতদল কিছুতেই বুঝ্‌বে না, তার পর অপমানিত হ'য়ে সকলের সমক্ষে আফিস হ'তে বেরব! তখন বন্ধু-বান্ধবেরা বল্‌বে বড় সাহেবের আবদারে যোগেশ বাবুর মেজাজটা এত তীরিক্ষি হয়ে গেছ্‌ল, যে ফ্রেঞ্চ সাহেবকে গণ্যই করেন নি। আমাকেই সকলে ধিক্কার দেবে, তখন শতদলবাসিনী খাবেন কি?"

ভেবে ভেবে যোগেশ জোড়হাতে ভগবানের নিকট প্রার্থনা কল্লেন, "আমি কি করব ব'লে দাও। আমি গঙ্গাতীরে ব'সে বল্‌ছি, লেশমাত্র স্পর্দ্ধা যেন আমার না থাকে আমার এই অবস্থায় সরল কর্ত্তব্য যা—তাই দেখিয়ে দাও। আমি অনেক সয়েছি, আরও সইতে আপত্তি নাই। আমার আবার মান অপমান কি? তুমি যা ব'লবে, তাই করব, আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই, জেদ নাই, দম্ভ নাই, তুমি আমায় নির্ভয় কর। তুমি ফ্রেঞ্চ-বেরি সাহেবের কর্ত্তা, আমারও কর্ত্তা। তাঁরা আমায় পায়ে থেৎলাবেন, আর আমি স'য়ে থাক্‌ব, এই যদি তোমার বিধান হ'য়ে থাকে, তাই হো'ক, আমি কর্ত্তব্য কি তা বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা, তাই বুঝিয়ে দাও।" এই বল্‌তে বল্‌তে যোগেশের গণ্ড প্লাবিত ক'রে চোখের জল পড়্‌তে লাগ্‌ল, তখন মনে শান্তি এল। কে যেন তাঁর চোখ মুছতে এলেন, সাঁঝের হাওয়ায় যোগেশ তাঁর স্পর্শ স্পষ্ট অনুভব কর্‌লেন। আকাশের তারাগুলি যেন বলে উঠ্‌ল—"আমরা পথ দেখাব, পথ দেখাব, যারা পথ ভোলে ও সরলভাবে পথ দেখ্‌তে চায়, তাদের আমরা পথ দেখাই।" গঙ্গা যেন তাঁর ঢেউএর করতালি দিয়ে বলে যেতে লাগ্‌লেন—"রে, অবোধ, ভয় নাই, যারা তাঁর শরণ নেয়, তাদের ভয় থাকে না।" দূর মাঠের উপর সার্চ্চলাইট পড়ে ধান্যশালিনী

বসুন্ধরা যেন বলে উঠ্‌লেন—“যাদের খাবার নেই, আমরা তাদের
জোগান দেই, এই নিত্য রন্ধনশালায় কর্ম্মীরা উপো’স থাকে না।”
যেন সম্মুখ ও পেছন থেকে বল্‌তে লাগ্‌ল—“আমি আছি। শত শত
সাহেব তোর কি কর্‌তে পারে? আমি সেই গীতার সহস্রশীর্ষ
আমার সহস্র বাহু তাকে আশ্রয় দেয়,—যে সত্যি সত্যি আশ্রয় চায়।
তোর পুত্র-কলত্র দিয়েছি, আমার কথা শুনবি না তাদের কথা শুনবি

সহসা বিদ্যুতের মত একটা তেজের প্রবাহ যেন যোগেশের
দেহের মধ্যে প্রবাহিত হ’য়ে গেল। সে মনে করল, যেন সে তার
ভিতর অর্জ্জুনের গাণ্ডীবটা পেয়েছে। সে বুঝ্‌ল, এই সংসার
কর্ম্মশালা—এখানে কারো এক চেটিয়া নাই। যে কাজ করে সে কর
যে ভীরু অলস পরানুগ্রহপ্রার্থী, সে বাঙ্গালী জাতির মত অধম হ’য়ে থ
“এই কর্ত্তব্যের জন্য আমি দধিচীর মত নিজের অস্থি বিসর্জ্জন দেব।
চৈতন্য, কত বুদ্ধ, কত তুকারাম স্ত্রীপুত্র সংসার ছেড়ে গেছেন,
হিতের জন্য। এই বাঙ্গালীর সংসারের শত শত দুঃখ দূর করবার ভা
ভগবান আজ আমার হাতে দিলেন। আমি বুঝলুম, প্রাণে প্রাণে
এই শত শত লোকের, যুগ-যুগের কষ্ট একটা প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন যা
একজনের প্রায়শ্চিত্ত চাই। দশজন তো অদৃষ্টের ক্রীড়নক, অবস্থার
একজন যদি নিজের সুখ আহুতি দিয়ে তার নিবেদিত জীবনের তপ
প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সমস্ত জাতির দুঃখ দূর করিতে না দাঁড়ায়, তবে যে
অধঃপাতে যেতে বসেছে, আমি সেই একজন হব।” সেই দিন
প্রফুল্লতা নিয়ে যোগেশ বাড়ী ফিরলেন। শতদল দেখ্‌লেন, তার
মুখ প্রসন্ন,—যেন বিষাদের শেষ ঘোরটি অবধি কেটে গেছে। কিন্ত
আরাম নহে, এ যে সাধনা, সোয়াস্তি নয়, চির অসোয়াস্তির ব্রত
সংযম, শতদল তা’ বুঝতে পারেন নাই।

৩.

বিপিন মাকে অনেক ব'লে ক'য়ে একবার গণেশের কীর্ত্তন তাদের বাড়ীতে দিয়েছিল। মা গল্পের বই পড়্‌তে ভাল বাস্‌তেন। খোলের বাজনা শুনে ও দোহারদের চীৎকারে, তার মাথা ধরে উঠ্‌ল এবং কীর্ত্তন থামিয়ে দিয়ে এক শিশি ওডিকলন সিল্কের রুমালে ভিজিয়ে মাথায় বেঁধে তবে সে মাথা ধরা হ'তে অব্যাহতি পান।

বিপিন খুব অপ্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু তথাপি "মাথুর" গানের কথা মনে হ'তে, তার চোখে জল আস্‌ত। গোষ্ঠ শুনে তো সে কৃষ্ণপ্রেমে একবার বিহ্বল হয়ে পড়্‌ত। একদিন সারারাত্রি জেগে সে "রূপ" শুনেছিল। তন্বঙ্গী রাধা নীল আঁচলে শরীরের অর্দ্ধেকটা ঢেকে অভিসারে যাচ্ছেন,—কতদূরে গিয়ে তার পা' চলে না; তিনি তো রাজার মেয়ে, দুই সখীর কাঁধে দুটি বাহু রেখে, কেলিকুঞ্জবন ও কদম্বকানন কতদূরে, ছল্ ছল্ চোখে জিজ্ঞেস কচ্ছেন। রাত্রি আঁধার, ঘোর বাদলা,—তার উপর মাথার উপরে ঘনপত্রাচ্ছাদিত তরুশাখা, বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোকে সেই আঁধার কানন হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠে, হঠাৎ কোন সদ্যস্ফুট পুষ্পের কোমল স্পর্শে রাধা শিহরিত হয়ে উঠেন, জিজ্ঞেস করেন,—"কার এ কোমল পরশ?"

বিপিন "রূপ" শুন্‌তে শুন্‌তে কেবলই চৈতন্যদেবকে মনে করত। তিনিও ত এইরূপ ঝাড়িখণ্ডের গহন বনে এবং দাক্ষিণাত্যের নিবিড় জঙ্গলে রাত্রি দিন এমনই বিহ্বলতার সহিত সংসার ছাড়িয়া কৃষ্ণ-কুঞ্জ খুঁজেছিলেন, তাঁর ও তো দুই চক্ষে ধারা ব'য়ে যেত, দুর্গম জঙ্গলে পথ দেখ্‌তে পেতে না। চৈতন্য যা ক'রে গেছেন, সেই প্রত্যক্ষ লীলা কবিরা রূপাভিসারে এঁকেছেন, তাই এই সকল গান এত জীবন্ত হয়েছে।

তুমি কিছুদিন ছেলেদেরে নিয়ে বাপের বাড়ীতে থাক্‌বে, তারপর আমার উপার্জ্জনের একটা ব্যবস্থা হ'লে আবার একত্র হব।" শতদল মুখ ম্লান ক'রে বল্লেন—"বাবা বৃন্দাবনবাসী হয়েছেন, দাদার ভাব তো তোমার অজানা নেই। যেবার বাবা চলে গেলেন সেই বার তোমার জন্য একখানি কাশ্মীরি শাল পাঠিয়ে ছিলেন, এবং ছেলেদের ঢাকাই ধুতি-চাদর দিয়ে গিয়েছিলেন, আমার [illegible] বেনারসীখানাও সেই বার পূজোয় তত্ত্ব করেছিলেন, তার পর ভাই এই দুই বৎসরের মধ্যে একবারটি জিজ্ঞাসা করেছেন?

"আমি তাদের কাছে হাত পাততে চাই না, তুমি যদি স্বামী হ'য়ে আমাকে সেই দুর্গতির মধ্যে ফেল্‌তে চাও, তবে আর কি কর্‌ব? তুমি এখন, সাহেব তার চাপরাসী বা পশুপতির কাছে ফিস্ ফিস্ করে কি বল্‌ছে, সেই অপমান সইতে পার্‌ছ না, তার পর যদি বাপের বাড়ী হ'তে আমাকে তাড়িয়ে দেয় কিম্বা বিপিনকে গরুর লেজ ঠেলে গাড়ী চালিয়ে জীবিকা অর্জ্জন করতে হয়,—তাতে কি খুব সম্মান বাড়'বে।"

এর পরে আর কিছু বল্‌বার নাই, অথচ ফ্রেঞ্চ সাহেবের দৌরাত্ম্য দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল। একদিন বড় বাবু কি একটা কথা বলতে গিয়েছিলেন, তখন ভ্রুকুঞ্চিত করে সাহেব তাঁকে "নিগার, ষ্টপ" বলে ধমক দিয়েছিলেন। যোগেশের মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু রাগের বশে তিনি কিছু কর্‌বেন না, স্থির করেছিলেন। সুতরাং এবারও কোন উত্তর তাঁর মুখে এল না।

সেই দিন সন্ধ্যার পর তিনি গঙ্গার ধারে এসে আহেরীটোলার ঘাটে বসে ব'সে চিন্তা করতে লাগলেন। গঙ্গার ধারের দৃশ্যটি বড় সুন্দর—নৌকায় নৌকায় দীপ জ্বলে উঠেছে, বড় বড় ষ্টীমার হ'তে সার্চ্চ লাইট সপুচ্ছ বিদ্যুতের মত বের হ'য়ে দূর দূরান্তরের পল্লীর বৃক্ষাবলীর মাথায় যেন হঠাৎ সোনার মুকুট পরিয়ে দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সান্ধ্য-সমীরণের

মৃদুল প্রবাহ শরীর স্পর্শ করে যেন জুড়িয়ে গেল। যোগেশ ভাবছেন—"কি করা যায়! যে রকম ভাব দেখ্‌ছি, তাতে আমায় তাড়াবে,—এর পরে তিনকড়ি দারোয়ান এসে বলবে, 'আপনি উঠুন, বাবু, সাহেবের হুকুম' সেই শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করে বসে থাক্‌ব? শতদল কিছুতেই বুঝ্‌বে না, তার পর অপমানিত হ'য়ে সকলের সমক্ষে আফিস হ'তে বেরব! তখন বন্ধু-বান্ধবেরা বল্‌বে বড় সাহেবের আবদারে যোগেশ বাবুর মেজাজটা এত তীরিক্ষি হয়ে গেছ্‌ল, যে ফ্রেঞ্চ সাহেবকে গণ্যই করেন নি। আমাকেই সকলে ধিক্কার দেবে, তখন শতদলবাসিনী খাবেন কি?"

ভেবে ভেবে যোগেশ জোড়হাতে ভগবানের নিকট প্রার্থনা কল্লেন, "আমি কি করব ব'লে দাও। আমি গঙ্গাতীরে ব'সে বল্‌ছি, লেশমাত্র স্পর্দ্ধা যেন আমার না থাকে আমার এই অবস্থায় সরল কর্ত্তব্য যা—তাই দেখিয়ে দাও। আমি অনেক সয়েছি, আরও সইতে আপত্তি নাই। আমার আবার মান অপমান কি? তুমি যা ব'লবে, তাই করব, আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই, জেদ নাই, দম্ভ নাই, তুমি আমায় নির্ভয় কর। তুমি ফ্রেঞ্চ-বেরি সাহেবের কর্ত্তা, আমারও কর্ত্তা। তাঁরা আমায় পায়ে থেৎলাবেন, আর আমি স'য়ে থাক্‌ব, এই যদি তোমার বিধান হ'য়ে থাকে, তাই হো'ক, আমি কর্ত্তব্য কি তা বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা, তাই বুঝিয়ে দাও।" এই বল্‌তে বল্‌তে যোগেশের গণ্ড প্লাবিত ক'রে চোখের জল পড়্‌তে লাগ্‌ল, তখন মনে শান্তি এল। কে যেন তাঁর চোখ মুছতে এলেন, সাঁঝের হাওয়ায় যোগেশ তাঁর স্পর্শ স্পষ্ট অনুভব কর্‌লেন। আকাশের তারাগুলি যেন বলে উঠ্‌ল—"আমরা পথ দেখাব, পথ দেখাব, যারা পথ ভোলে ও সরলভাবে পথ দেখ্‌তে চায়, তাদের আমরা পথ দেখাই।" গঙ্গা যেন তাঁর ঢেউএর করতালি দিয়ে বলে যেতে লাগ্‌লেন—"রে, অবোধ, ভয় নাই, যারা তাঁর শরণ নেয়, তাদের ভয় থাকে না।" দূর মাঠের উপর সার্চ্চলাইট পড়ে ধান্যশালিনী

বসুন্ধরা যেন বলে উঠ্‌লেন—"যাদের খাবার নেই, আমরা তাদের খাবার জোগান দেই, এই নিত্য রন্ধনশালায় কর্ম্মীরা উপো'স থাকে না।" কে যেন সম্মুখ ও পেছন থেকে বল্‌তে লাগ্‌ল—"আমি আছি। শত শত ফ্রেঞ্চ সাহেব তোর কি কর্‌তে পারে? আমি সেই গীতার সহস্রশীর্ষ পুরুষ। আমার সহস্র বাহু তাকে আশ্রয় দেয়,—যে সত্যি সত্যি আশ্রয় চায়। আমি তোর পুত্র-কলত্র দিয়েছি, আমার কথা শুনবি না তাদের কথা শুনবি?"

সহসা বিদ্যুতের মত একটা তেজের প্রবাহ যেন যোগেশের সমস্ত দেহের মধ্যে প্রবাহিত হ'য়ে গেল। সে মনে কর্‌ল, যেন সে তার মুঠোর ভিতর অর্জ্জুনের গাণ্ডীবটা পেয়েছে। সে বুঝ্‌ল, এই সংসার বিরাট কর্ম্মশালা—এখানে কারো এক চেটিয়া নাই। যে কাজ করে সে কর্ত্তা হয়, যে ভীরু অলস পরানুগ্রহ প্রার্থী, সে বাঙ্গালী জাতির মত অধম হ'য়ে থাকে। "এই কর্ত্তব্যের জন্য আমি দধিচীর মত নিজের অস্থি বিসর্জ্জন দেব। কত চৈতন্য, কত বুদ্ধ, কত তুকারাম স্ত্রীপুত্র সংসার ছেড়ে গেছেন, লোকের হিতের জন্য। এই বাঙ্গালীর সংসারের শত শত দুঃখ দূর করবার ভার যেন ভগবান আজ আমার হাতে দিলেন। আমি বুঝলুম, প্রাণে প্রাণে বুঝলুম, এই শত শত লোকের, যুগ-যুগের কষ্ট একটা প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন যাবে না। একজনের প্রায়শ্চিত্ত চাই। দশজন তো অদৃষ্টের ক্রীড়নক, অবস্থার দাস। একজন যদি নিজের সুখ আহুতি দিয়ে তার নিবেদিত জীবনের তপস্যা ও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সমস্ত জাতির দুঃখ দূর করিতে না দাঁড়ায়, তবে যে সকলে অধঃপাতে যেতে বসেছে, আমি সেই একজন হব।" সেই দিন অপূর্ব্ব প্রফুল্লতা নিয়ে যোগেশ বাড়ী ফিরলেন। শতদল দেখ্‌লেন, তার স্বামীর মুখ প্রসন্ন,—যেন বিষাদের শেষ ঘোরটি অবধি কেটে গেছে। কিন্তু এ যে আরাম নহে, এ যে সাধনা, সোয়াস্তি নয়, চির অসোয়াস্তির ব্রতগ্রহণের সংকল্প, শতদল তা' বুঝতে পারেন নাই।

৫

বিপিন মাকে অনেক ব'লে ক'য়ে একবার গণেশের কীর্ত্তন তাদের বাড়ীতে দিয়েছিল। মা গল্পের বই পড়্তে ভাল বাস্তেন। খোলের বাজনা শুনে ও দোহারদের চীৎকারে, তার মাথা ধরে উঠ্ল এবং কীর্ত্তন থামিয়ে দিয়ে এক শিশি ওডিকলন সিল্কের রুমালে ভিজিয়ে মাথায় বেঁধে তবে সে মাথা ধরা হ'তে অব্যাহতি পান।

বিপিন খুব অপ্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু তথাপি "মাথুর" গানের কথা মনে হ'তে, তার চোখে জল আস্ত। গোষ্ঠ শুনে তো সে কৃষ্ণপ্রেমে একবার বিহ্বল হয়ে পড়্ত। একদিন সারারাত্রি জেগে সে "রূপ" শুনেছিল। তন্বঙ্গী রাধা নীল আঁচলে শরীরের অর্দ্ধেকটা ঢেকে অভিসারে যাচ্ছেন,—কতদূরে গিয়ে তার পা' চলে না; তিনি তো রাজার মেয়ে, দুই সখীর কাঁধে দুটি বাহু রেখে, কেলিকুঞ্জবন ও কদম্বকানন কতদূরে, ছল্ ছল্ চোখে জিজ্ঞেস কচ্ছেন। রাত্রি আঁধার, ঘোর বাদলা,—তার উপর মাথার উপরে ঘনপত্রাচ্ছাদিত তরুশাখা, বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোকে সেই আঁধার কানন হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠে, হঠাৎ কোন সদ্যস্ফুট পুষ্পের কোমল স্পর্শে রাধা শিহরিত হয়ে উঠেন, জিজ্ঞেস করেন,—"কার এ কোমল পরশ?"

বিপিন "রূপ" শুন্‌তে শুন্‌তে কেবলই চৈতন্যদেবকে মনে কর্‌ত। তিনিও ত এইরূপ ঝাড়িখণ্ডের গহন বনে এবং দাক্ষিণাত্যের নিবিড় জঙ্গলে রাত্রি দিন এমনই বিহ্বলতার সহিত সংসার ছাড়িয়া কৃষ্ণ-কুঞ্জ খুঁজেছিলেন, তাঁর ও তো দুই চক্ষে ধারা ব'য়ে যেত, দুর্গম জঙ্গলে পথ দেখ্‌তে পেতে না। চৈতন্য যা ক'রে গেছেন, সেই প্রত্যক্ষ লীলা কবিরা রূপাভিসারে এঁকেছেন, তাই এই সকল গান এত জীবন্ত হয়েছে।

বিপিন মায়ের কাছে ব'সে মহাপ্রভুর জীবন বল্‌তে থাকৃত,—তাঁর গয়াযাত্রার কথা বল্‌তে গিয়া সে চোখের জল সাম্‌লাতে পারত না। শতদল বলতেন,—"তুই কাঁদবি না কথা বলবি ? একটি ছেলে, তাও মেয়ের বাড়া। উনি সেদিন আমায় নেপোলিয়ানের জীবনা-কথা শুনিয়েছেন, তা' মনের ভিতর একটা প্রেরণা আনে। আর তুই একটা মেয়ে প্রকৃতির লোক, তোর কাঁদুনে গোঁসাই নিয়ে আছিস্।"

কিন্তু হাজার নিরস্ত করে, কথায় ভালবাসা হয় না, কথায় ভালবাসা যায় না। বিপিন ন'দের ঠাকুরকে প্রাণ দিয়েছে, সে প্রাণ আবার নেবে কে ? মাতার কথায় নিরুৎসাহ হ'য়েও বিপিন দণ্ডে দণ্ডে চৈতন্যের মুখখানি কল্পনায় আঁকিয়ে ফেলে। শিশিরে ধোয়া ফুল্ল পঙ্কজের,—সে মুখের সঙ্গে তুলনা হয় না ; তাঁর প্রেমবিকম্পিত দেহ যষ্ঠীর বাততাড়িত ফুল্ল রজনী-গন্ধার শোভার সঙ্গে তুলনা হয় না। চৈতন্যই তাহার ধ্যান, তাঁর লীলাই তার স্মরণীয়।

একদিন মাতা-পুত্রে বসিয়া কথাবার্ত্তা হতেছিল। মায়ের কতকটা তাচ্ছিল্য সত্ত্বেও বিপিন তাঁকে বুঝুতে চেষ্টা করেছিল যে, যারা মানুষ মারে, তার চাইতে যাঁরা মানুষকে ভালবাসা দেন, তাঁরাই বড়। শতদল বল্লেন, "তবে কি তুই মনে করিস, অর্জ্জুনের চাইতে, রামের চাইতেও তোর চৈতন্য বড়।" বিপিন বল্লে—"তা' জানিনা, কে বড় কে ছোট কি করে বল্‌ব ? আমার কাছে যে ভালবাসে তাকেই বড় ব'লে মনে হয়। এই দে'খ না মা, এখন যদি অর্জ্জুন তাঁর গাণ্ডীব নিয়ে আমার কাছে আস্‌তেন, আমি তাঁর থেকে নিশ্চয়ই তোমাকে বেশী ভালবাসতুম।" এই ব'লে বিপিন তার মায়ের আঁচলে মুখ ঢেকে অপার আনন্দে বল্লে—'মা, তুমিই তো স্নেহকে আমার কাছে বড় ক'রে দেখিয়েছ। আমি না খেলে তুমি খাও না, আমি অসুস্থ হ'লে তুমি কত ভাব, সারারাত জেগে আমায় হাওয়া কর।

কোনখানে গেলে "কই, বিপিন এল না" বলে কত দুশ্চিন্তা ভাব। মা, তুমি যে ভালবাসার খনি, তোমার কাছে ভালবাসার দাম বুঝেছি, মা তাই তো আমি আমার ভালবাসার ঠাকুরকে চিনেছি। আমি গাণ্ডীব টাণ্ডীব বুঝি না।" এই কথা শুনে শতদল বিপিনের গণ্ডে একটা চুমো খেয়ে বল্‌তেন—"বেশ তাই বাসিস, তোর পুরুষের মত কথাবার্ত্তা নয়—তুই যেন আমার একটি মেয়ে।"

মাতাপুত্রে যখন এই ভাবের কথাবার্ত্তা হ'তেছিল তখন যোগেশ একখানি পত্র হাতে ক'রে সেইখানে উপস্থিত হয়ে বল্লেন,—"আজ জন্‌সন্ সাহেবের চিঠি এসেছে।"

শতদল বেশী আগ্রহ না দেখিয়ে বল্লেন,—"কি লিখেছেন? যাঁরা নিজেরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চূড়োর উপর বসে আছেন, তাঁরা দুঃস্থ ব্যক্তিকে পরামর্শ দিতে পারেন। তাঁরা যদি নিজেরা তেমন অবস্থায় পড়্‌তেন, তবে বোঝা যেত।"

যোগেশ—"তুমি দেখ্‌ছি, আমার গুরুতুল্য জন্‌সন্ সাহেবের বিরুদ্ধেও কথা বল্‌ছ। আমার জীবনের যা কিছু সুখ-সাফল্য, তা' যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি, যিনি বিলাতে ব'সেও আমার কথা ভাবৃছেন, তা সম্বন্ধেও তুমি অবজ্ঞার সঙ্গে কথা কইচ।"

শতদল—"মাপ কর, মিছা বকাবকির প্রয়োজন কি? তিনি কি লিখেছেন, প'ড় না।"

শতদল বেশ ইংরেজী শিখেছিলেন, তাঁর পিতা রাজীব চৌধুরী স্ত্রীলোকের শিক্ষার অনুকূল ছিলেন এবং শৈশবে শতদলের সমুচিত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আর কথা না বাড়িয়ে যোগেশ বাবু জন্‌সন্ সাহেবের চিঠিখানি পড়্‌তে লাগ্‌লেন। চিঠিখানি খুব লম্বা নয়, কিন্তু সহানুভূতিপূর্ণ।

"প্রিয় যোগেশ!

তোমার চিঠিখানি প'ড়ে খুব দুঃখিত হলুম। কিন্তু এ সকল যে ঘট্‌বে, তা' আমি পূর্ব্বেই জানতুম। যে সকল অবস্থা লিখেছ, দূর হ'তে সেই সকল অবস্থার উপর আমার কোন হাত নাই। যাঁরা কর্ম্মস্থলে আছেন, তাঁদের ডিঙ্গিয়ে এখানকার ডিরেক্টারেরা কিছু করবেন না,—ইহাতে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। এতদূরে থেকে যদি সেখানকার কর্ম্মচারীদের কার্য্যে তাঁদের গুরুতর আপত্তি সত্ত্বেও এখানকার ডিরেক্টরেরা হস্তক্ষেপ করেন, তবে আফিস একবারে অচল; আমি অনেক চিন্তা ক'রে দেখ্‌লুম, তোমারও এ অবস্থায় কাজে ইস্তাফা দেওয়াই উচিত। এমন কি, আমি এটাও মনে করি, যদি তোমার কোন পৌরুষ থাকে, তবে তাঁরা যদি কোন পেন্সন দিতে চান্, সেই তাচ্ছিল্যের দান তুমি গ্রহণ কো'র না।

"গত যুদ্ধে আমার উপার্জ্জনক্ষম পুত্রটি মারা গেছে। আমি যে পেন্সন পাই, তাতে এখনকার বাজারে এখানে মান-ইজ্জৎ রক্ষা ক'রে চলা কঠিন হয়ে উঠেছে। তথাপি তুমি যদি কিছু মনে না কর, তবে আমি তোমাকে মাসিক ত্রিশ টাকা ক'রে সাহায্য করতে পারি। এ টাকায় তোমার কিছু হবে না সত্য, তথাপি তোমার প্রতি আমার স্নেহ যে অকৃত্রিম, এটি দেখান হবে। আগামী আগষ্ট মাস থেকেই এই টাকাটা রীতিমত পাঠাবার ব্যবস্থা হবে। নিজকে হীন ক'র না,—মানুষের মধ্যে যে মহৎ ভাবগুলি আছে, তা' বিপদে পড়ে সে রক্ষা করতে পারে কিনা, এই জন্য সর্ব্বনিয়ন্তা তাঁকে এই সকল অগ্নি-পরীক্ষায় ফেলেন। তুমি মানুষের মত এই পরীক্ষা হ'তে উত্তীর্ণ হও, ইহাই আমার প্রার্থনা।

তোমার স্নেহবদ্ধ

৮ই জুলাই, ১৯২২। বুড় জন্‌সন্

শতদল বল্লেন—"এখন কি ক'রবে? ৩০০ শত টাকা মাহিয়ানার কাজটি ছেড়ে দিয়ে জন্‌সন্‌ সাহেবের দেওয়া ত্রিশটি টাকা ভিক্ষা গ্রহণ করবে? তাতে তো পেট চল্‌বে না, বরঞ্চ ভিক্ষুক সাজতে হবে। তোমার চোখের কাছে তো কত কেরাণী আফিসে কত লাঞ্ছনা, গালাগালি, 'ড্যাম' 'নিগার' 'শুয়োর' প্রভৃতি কটূক্তি স'য়ে টিকে আছে। তারা স্ত্রীপুত্রকে ভালবাসে, এজন্য তদের এ সকল সইতে হয়। নতুবা গালাগালি কি তাদের বড় মিষ্টি লাগে,? তেতো জিনিষটা তো সকলের কাছেই তেতো।"

যোগেশ বাবু ধীর কণ্ঠে কিন্তু দৃঢ় ভাবে বল্লেন—"আমি তা' সইব না। জন্‌সন্‌ সাহেব টাকার অভাবে পড়েছেন, আমি তাঁর ত্রিশ টাকা নেব না। কিন্তু এই টাকা আমি ভিক্ষা মনে করি না, এই দানের মাপকাটি টাকার সংখ্যা নহে, ইহার মাপ কাটি তাঁর অপ্রেমেয় স্নেহ, সেই মাপ দিয়ে ওজন কর্‌লে এই ত্রিশটি টাকা অমূল্য। তা যা' হোক গে, আমি তাঁকে লিখব— "দরকার হ'লে আপনার সাহায্য চেয়ে নেব, এখন পাঠাবার দরকার নাই।" এমনি করে চিঠি লিখব—যেন তিনি মনে কোন ব্যথা না পান।"

"তার পর?"

"তার পর চাকুরী ছেড়ে দেব।"

"আমাদেরেও ছাড়্‌বে?"

"আমি ইচ্ছা ক'রে তোমাদের ছাড়্‌ব—এ কথা সম্ভব নয়, তবে তোমরা যদি আমায় ছাড়—তবে কলিজার হাড় তুলে ফেল্লেও লোক বেঁচে থাকার চেষ্টা করে।"

"বেশ, বেঁচে থাকার চেষ্টা কো'র।"

৬

এর মধ্যে পল এণ্ডারসনের সাহেবদের বোর্ডের একটা সভা হ'ল। এইরূপ সভায় কাগজপত্রের নথি সহ বড়বাবুকে উপস্থিত হ'তে হ'ত। বৎসরের বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা করা বোর্ডের সেদিনকার অধিবেশনের অন্যতম কার্য্য ছিল। সেই কার্য্য শেষ হলে বিবিধের মধ্যে "বড় বাবুর মৌখিক নিবেদন শীর্ষক" একটা কাজের উল্লেখ ছিল। বড় বাবু দাঁড়িয়ে বল্লেন—"আমি আপনাদের একটু সময় নেব। আমি আজ কুড়ি বছরের উপর আপনাদের এখানে কাজ কচ্ছি, আজ কয়েকটা কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন, আপনারা আমাকে আধ ঘণ্টা সময় দেবেন।" ফ্রেঞ্চ সাহেব ঘোর বিরক্তির সঙ্গে বল্লেন,—"আপনার কি কথা থাকতে পারে যে, এই বর্ষায় দুর্যোগে সারাদিনের খাটুনির পর এই আবদ্ধ ঘরে আমাদিগকে আধঘণ্টা কাল দম আট্‌কিয়া মারবেন?"

বড় বাবু বল্লেন—"আপনাদের কাছে এই আমার শেষ নিবেদন, আর কোনদিন উপস্থিত হবার হয়ত প্রয়োজনই হবে না। দয়া ক'রে যদি শোনেন, তবে আমার কথা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত যেন কেউ বাধা না দেন, এই আমার অনুরোধ।"

ফ্রেঞ্চ সাহেব একান্ত ক্রোধের সহিত বল্লেন,—"কি বিপদ! বলে যান, কাজের তালিকায় এই 'নিবেদন'টা কে ব'সিয়ে দিয়েছে?"

বড়বাবু—"আমি দিয়েছি এবং আপনি দস্তখৎ করেছেন।" সাহেবদের মধ্যে যোগেশবাবুর সে দিনকার হাবভাব দেখে একটু বিস্ময়ের ভাব এসেছিল, তাঁহারা বিরক্ত হইলেও একটু কৌতূহলী না হয়েছিলেন, এমন নয়। বোর্ডের সভায় বাঙ্গালীবাবুর বক্তব্য কি থাকতে পারে! সুতরাং যদিও কেউ কেউ বলেছিলেন—"আজ থাক, আর একদিন হবে", অধি-

কাংশের মতে নিবেদনটি সেই সভায়ই উপস্থিত করা সাব্যস্ত হ'ল। ফ্রেঞ্চ সাহেব ভাব্‌লেন,—লোকটার নিতান্তই মাথা খারাপ হয়েছে, আজ যদি বেফাঁস কিছু ব'লে ফেলে, তবে এই সুযোগে তার একটা মনের মত শাস্তির ব্যবস্থা করতে পার্‌বেন, এজন্য তিনি খুব জোরে বাধা দিলেন না।

যোগেশবাবু ব'লে যেতে লাগ্‌লেন।

"এই কোম্পানির জন্য আমি কি করেছি, তা হয়ত আজকার দিনে অনেকের মনে নাই। রেঙ্গুনে স্লিপারের কাজের সুবিধা করতে গিয়া ১৯১৮ সনে পাহাড়ে হাতীর তাড়া খেয়ে প্রাণ যাওয়ার দাখিল হয়েছিল। সেখানে রান্‌ফা নামক এক ধনশালী চীনের সঙ্গে ভাব করে আমি এমন কাজের সুবিধা করে এসেছিলুম, যাতে ক'রে কোম্পানির আয় বছরে দেড় লক্ষ টাকা বেড়ে গেছে।

"ইরাবতীর যে খাল দিয়ে এখন আমাদের কাঠ ও চা'ল রপ্তানি হচ্ছে, সে খালটা আমার প্রস্তাবে কাটান হয়, তাতে বছর বছর কোম্পানির কুড়ি হাজার টাকা খরচ বেচে যাচ্ছে। তা' ছাড়া যখন প্রথম আমি এই আফিসে আসি, তখন আমাদের পাটের ব্যবসা ৬০,০০০, টাকার ছিল, এ বছর সেই ব্যবসা বিশ লক্ষের উপর দাঁড়িয়েছে। এই সাফল্য বহু পরিমাণে আমারই প্রাণান্ত পরিশ্রমের দরুণ হয়েছে। ডিরেকটার সাহেবেরা অনেক বার আমার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার প্রশংসা করেছেন এবং ১৯১৮ সনে খুসী হয়ে আমাকে ৭৫৲ টাকা হ'তে একেবারে ২২৫৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন, এখন আমি তিনশত টাকা পাচ্ছি।"

ফ্রেঞ্চ—"এ সকল আত্মপ্রশংসা শুনাবেন ব'লে কি আপনি আমাদের এই সন্ধ্যাবেলা আট্‌কে রেখে দিয়েছেন? আপনি যদি কিছু কাজকরে থাকেন, তা' শুধু আপনার চেষ্টায় হয়নি, আফিসের অপরাপর কর্ম্মচারীদেরও সেই প্রশংসার উপর কিছু দাবী আছে, তবে জন্‌সন্ সাহেবের অনুগ্রহে

আপনার উন্নতিটা বেশ লাফিয়ে লাফিয়ে হয়েছে। এখন যতটা উঠ্‌বার তা তো উঠেছেন, সূর্য্যও মধ্যাকাশে স্থির হয়ে ব'সে থাকেন না, তারও অস্তগমন আছে, আপনি সাবেকী কাজের পুরস্কার পেয়েছেন ব'লে এখনকার কাজের ত্রুটির তিরস্কারটা এড়াতে পার্ব্বেন না।"

যোগেশ। "আমি যে কথা বল্‌তে দাঁড়িয়েছি, তা সমাধা কর্‌তে অনুমতি চাই। তারপর যদি তিরস্কার প্রাপ্য থাকে, তা মাথা পেতে নেব।"

"আমি যে কাজের জন্য যে বেতন পাচ্ছি সাহেব হ'লে তার বেতন মাসিক ৩০০০৲ টাকা হ'ত।

এই কথায় সাহেবের মুখ রক্তিম হয়ে উঠ্‌ল, তাহা গ্রাহ্য না করে যোগেশবাবু বল্‌তে লাগলেন—

"জন্‌সন্ সাহেবদের স্নেহগুণে আমি অক্লান্ত ভাবে খেটে এসেছি। পার্শনাল এ্যাসিস্‌টেণ্টের পদ একটা সৃষ্ট হবে, জন্‌সন্ পূর্ব্ব হ'তে তাহা জান্‌তেন। তিনি বলেছিলেন "এ কাজ সম্পর্কে তুমি ছাড়া আর কারুর নাম কর্তৃপক্ষের মনে আস্‌তেই পারে না।

"জন্‌সন্ চলে যাওয়ার পর থেকে আমার ভাগ্যাকাশে সুখের তারা অস্তমিত হয়েছে। ১৯২২ সনের ১০ই জানুয়ারী সাহেব বিলাতে চলে গেছেন, ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ফ্রেঞ্চসাহেবের কাছে এক তাড়া আফিসের কাগজপত্রের নথি নিয়ে আধঘণ্টা কাল দাঁড়িয়ে থাকি। তিনি আমার সেলামটি পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নি। আমার কাজ অত্যন্ত জরুরী থাকা সত্ত্বেও আরদালিটার সঙ্গে বাজে কথা নিয়ে বকাবকি করতে থাকেন, এর মধ্যে আমার দিকে তার তাকাবার অবকাশও হয়নি। এবং আমি আধঘণ্টা পরে নিজের কামড়ায় ফিরে এলে, তার আরও একঘণ্টা পরে আমার না ব'লে চ'লে আসা অভদ্র ব্যবহার হয়েছে বলে তিরস্কার

করেন। সৌজন্যের অভাব তাঁর হয়েছিল না আমার হয়েছিল, তার বিচার আপনারা কর্‌বেন।"

ফ্রেঞ্চ। "আপনারা কি এই কালো কেরাণীটাকে দিয়ে আমায় এইভাবে অপদস্ত করাবেন?"

এই বোর্ডে অপরাপর ফারমের জন কয়েক সাহেব ছিলেন। পল এবং এণ্ডারসনের ফারমের সঙ্গে তাঁদের কোন কোন বিষয়ে সংশ্রব ছিল, তাঁরা ভিতরে ভিতরে ফ্রেঞ্চ সাহেবের উপর বিরক্ত ছিলেন, তাঁদের কাছে অভিযোগগুলি মন্দ লাগ্‌ছিল না। তাঁদের মধ্যে পিটার সাহেব মৌখিক ভদ্রতার ভাণ রেখে বল্লেন "দেখ্‌ছি, আপনাদের বড়বাবুটির মাথা খারাপ হ'য়ে গে'ছে। যা হৌক উনি যা বলছেন, তা' বল্‌তে দিন্ না! দেখি শেষ পর্য্যন্ত কতকটা গড়ায়। বেশী বাড়াবাড়ি হ'লে, হাতকড়ি লাগিয়ে বহরমপুর পাগলা গারদে চালান দেওয়া যাবে।"

যোগেশবাবু বল্‌তে লাগলেন "মার্চ্চমাস থেকে আমার উপর যে সকল দৌরাত্ম্য চল্‌ছে, তা' একবারে অকথ্য। রাম চোবে দারোয়ানের মারফৎ আমার অধীনস্থ কেরাণী পশুপতি মুখার্জ্জি আদেশ প্রেরণ কর্‌ছেন এবং আমার সেই আদেশ তামিল কর্‌তে হয়। অনুমাত্র দেরি হ'লে—চাপরাশিদের সামনে ফ্রেঞ্চ সাহেব আমাকে যা'তা বলে গালাগালি দেন। আমার সঙ্গে বেরি সাহেবের কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁর বিভাগ ভিন্ন, তথাপি তিনি প্রভুত্ব ফলিয়ে "একঘণ্টার মধ্যে আপনাকে এই কাজ ক'রে দিতে হবে"—এই বলে বাজে কাজের বোঝা আমার কাঁধে চাপিয়ে দেন। নমস্কার দিলে প্রত্যুত্তরে মাথাটি পর্য্যন্ত নাড়তে অপমান বোধ করেন। ফ্রেঞ্চ সাহেবকে কোন কথা বল্‌তে গেলে তিনি আমার কথার উত্তর না দিয়ে কোন তরুণ কেরাণীর সঙ্গে কথা কয়ে আমার দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে চলে যান।

"এই যে পার্শনেল এ্যাসিষ্টাণ্টের পদটি পশুপতি বাবুকে দিলেন, ইহা

আমার প্রাপ্য ছিল, আমাকে ডিঙ্গিয়ে ওঁকে দিলেন কেন? যা হো'ক তাঁর উন্নতিতে আমি দুঃখিত নাই। এরূপস্থলে মন্তব্য প্রকাশ করা আমার রীতি নহে। তবে কাটাঘায়ে আবার নুনের ছিঁটে কেন? অনাহূত ভাবে এই প্রসঙ্গে আমাকে টেনে এনে আমার প্রতি যা'তা' করে গালাগালি করে গত মেলে চিঠি পাঠান হয়েছে। তারপর কয়েক দিন হ'ল, আমি পত্রলেখকদিগের নাম-ঠিকানা খামের উপর লিখবার জন্য দুইমাসের জন্য একজন ২৫৲ টাকা বেতনের কেরাণী চেয়েছিলুম। অনেক পত্র আফিসে জমে পড়েছিল। সাহেব বল্লেন—"ঐ সকল নাম ঠিকানা বিকেলে আফিসের পর আপনি ব'সে ব'সে লিখুন।" এর চাইতে ঢের ছোট কাজ আমি ভালবাসার খাতিয়ে কর্তে প্রস্তুত, জন্সন্ সাহেব বল্লে—আমি রাত জেগে বাড়ীতে ব'সে এর থেকে দশগুণ কাজ ক'রে ফেলতুম। কিন্তু সর্ব্বদা চোখ রাঙ্গাবেন ও আমাকে দিয়ে ছোট কাজ করিয়ে আমার মাথাটা হেঁট করাবেন,—এই ত হচ্চে ওঁর ইচ্ছা। আমি উত্তরে বল্লুম—"আফিসের যাকে বড়বাবু করেছেন, তাকে দিয়ে এই কাজ করান কি সঙ্গত?"

"ফ্রেঞ্চসাহেব চোখ লাল ক'রে বল্লেন,"আমার কাজ সঙ্গত কি অসঙ্গত—তার কৈফিয়ৎ আপনাকে দিতে হ'বে না?" আমি কিছু বলতে চাচ্ছিলাম, তখন "নিগাড়, চুপ" এই বলে সবার সামনে আমাকে গালাগালি দিয়ে চলে গেলেন। সেদিন পশুপতিবাবুর বুদ্ধিতে বল্লভপুরের পাট কিনে হাতে হাতে কুড়ি হাজার টাকা লোকসান দিলেন, আমি কোম্পানির প্রতি আমার কর্ত্তব্য স্মরণ ক'রে বারংবার তাঁকে মানা করেছিলুম। আমার বাধাতে যেন ওঁর জেদ আরও বেড়ে গেল, যা'তা' বলে আরদালী চাপরাশি ও কেরাণীদের সামনে আমায় গাল দিতে লাগলেন। চাপরাশি পিয়ন—তারা পশুবাবুর প্রাইভেট দরকারে যখন ইচ্ছা তখন বাইরে চলে যায়, যখন ইচ্ছা তখন আসে, আমার কিছু বলবার অধিকার নেই। তারা

পশুবাবুর আদেশে আসে, তাঁর কাজ করে—আমি কিছু বল্লে গ্রাহ্য করে না।"

এই পর্য্যন্ত ব'লে যোগেশবাবু রুমালে মুখ মুছে পকেট হ'তে একখানি এস্তাফাপত্র বার কর্‌লেন এবং বল্লেন 'যদি ফ্রেঞ্চসাহেব প্রকাশ্যভাবে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং ভবিষ্যতে আমার কাজে কোনরূপ হস্তক্ষেপ কর্‌বেন না, এই প্রতিশ্রুতি দেন, এবং পশুবাবুকে যে কাজ দিয়েছেন, তাহাতে তাঁকে বহাল রেখে ও আমার বেতন ৩৫০, হইতে ৫০০, করে দেন, তবেই আমি এ কাজে থাকতে পারি, তাহা চাকুরীর খাতিরে নহে, এই কোম্পানির দ্বারা আমি এতদিন প্রতিপালিত হয়ে এসেছি, এজন্য আমি ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে কোম্পানির কাজে বিরাগ দেখাব—এরূপ যেন কেহ মনে না করতে পারেন—তজ্জন্য এই সর্ত্তগুলির উল্লেখ কর্‌লাম। আমি জানি এই এদের মূল্য কি—এগুলি নিতান্ত প্রলাপোক্তি বলে গণ্য হবে। সুতরাং আমার শেষ কথা জানিয়ে আপনাদের হাতে এই এস্তাফা পত্র দিচ্ছি।"

কার্য্য পরিত্যাগ পত্রখানি ফ্রেঞ্চসাহেবের টেবিলে রেখে যোগেশবাবু চ'লে যেতে উদ্যত হলেন। ফ্রেঞ্চ বল্লেন, "এতগুলি বাগাড়ম্বর না ক'রে আগে ঐ পত্রখানি দিলেই আপনার এই উত্তেজনাটার বাজে খরচ হ'ত না, এবং আমাদের কর্ম্ম ক্লান্ত দিবসের শেষভাগে ধৈর্য্যের এতটা অগ্নিপরীক্ষা দিতে হ'ত না।"

৬

পরদিন সকাল বেলা স্তব্ধ একখানি ছবির মত যোগেশবাবু একখানি কেদারায় বসে রইলেন। সুকুমারী ঝি চা, বিস্কুট নিয়ে টেবিলের উপর রেখে যেতে যোগেশবাবু বল্লেন "এ চা বিস্কুট নিয়ে যা', গিন্নিকে বল্‌গে— আমার চা' বিস্কুট খাওয়ার দিন ফুরিয়েছে। আর শোন এই হ্যাভেনা সিগারের বাক্স নিয়ে যা, আমার এ সকল বিলাসের জিনিষে আর দরকার নাই। বিপিন যে কয়টি মুড়ি খায়, তার যদি কিছু থাকে—তবে আমায় দিয়ে যাস্‌। তোদের মহিয়ানা কি বাকী আছে, তোদের—তুই ঝি, রামটহল দারোয়ান, শরৎচাকর ও ভিখনলাল ঠাকুর—তার হিসেব গিন্নিকে করতে বল্‌।"

বাবুর মুখ দেখে সুকুমারী ভয় খেয়ে গিয়েছিল। সে কোন কথা না ব'লে তাঁর আদেশ পালন করে চলে গেল। অমনি ঝড়ো হাওয়ার মত শতদল তথায় এসে বল্লেন, "চাকুরি বুঝি খুইয়ে এসেছ? যাও, সাহেবের বাড়ীতে, হাতে পায়ে ধ'রে অপরাধ স্বীকার করে পুনরায় বহাল হ'তে পার কিনা—চেষ্টা ক'রে দেখ। এতদিনের কর্ম্মচারী, মাথা নোয়ালে অবশ্য দয়া হবে। এমন সোনার সংসারটা হঠকারিতা করে ভেঙ্গে ফেল্‌বে?"

যোগেশবাবু মাথা হেট করে বল্লেন "আমার আর চাকুরী করা হবে না, শতদল। তোমার কোন কথার এ পর্য্যন্ত অবাধ্য হইনি, এবারটি আমায় মাপ করতে হবে, আমার শতদল পদ্ম, আমায় বল দাও আমার বল হরণ করতে এসনা, তুমি যদি ব'ল—তবে আনন্দের সঙ্গে আমি বাজারের মোট বহন করে এনে যা পাই, তা' দেব। কিন্তু যেখানে পদে পদে অপমান, যেখানে বড় সাহেবের সর্ব্বদা চেষ্টা যে আমার মাথা হেট করাবেন, সেখানে আমি আর ঢুকব না।"

"তুমি কি দুই মণের বোঝা মাথায় করে বাড়ী বাড়ী ঘুরতে পার্‌বে?

তোমার যে ঘাড় ভেঙ্গে যাবে! দিনান্তে তিন আনা রোজগার ক'রে কি তুমি সংসার চালাবে? তোমার ঝি চাকরেরাও যে তার চাইতে ঢের বেশী রোজগার ক'রে। তুমি মনে ভাবছ, সাহেব তোমার মাথা হেট করাচ্ছেন। সাহেব উপরিওলা, তুমি নিজে থেকে তাঁর কাছে মাথা হেট করলেই তো সব গোল চুকে যায়।—আর তা' কোন অসঙ্গত কাজও নয়। উপরিওয়ালার কাছে তো সবাই মাথা হেট ক'রে থাকে। হঠকারিতা ক'রে নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মের না, আখেরে কষ্ট পাবে।"

যোগেশবাবু দুটি হাত জোর করে বল্লেন, "মাপ ক'র শতদল, আমি তোমায় বিয়ে ক'রে দায়িক সেজেছি, তোমাদের সম্মান রেখে ভরণ পোষণ করা আমার কর্ত্তব্য। নিজের জন্য আমি থোরাই কেয়ার করি, আমি দিনান্তে শাক ভাত একবার খেয়ে মাটিতে শুয়ে ঘুমাতে পারি। কিন্তু তোমাদের প্রতি আমার একটা কর্ত্তব্য থাকলেও তার তো সীমা আছে। আমি আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়া পরের পদানত হ'য়ে কাজ করতে পারব না। তুমি ভেবেছ, আমি খোসামুদী করলেই এরা খুসী হবে, হ'তে পারে দুই একদিন। তার পরে শত্রুরা কাণাঘুষো করবে—সাহেবকে চটিয়ে দেবে, তারপরে যে সেই হবে। আমি যত অবনত হব, তত এরা পায়ে থেৎলাবে। আমি এদেরে চিনেছি, আমার মোট বইতে ঘাড় ভাঙ্গে তো—তাতে আমার আত্মার জোর থাকবে। আমি স্বাধীন ভাবে উপার্জ্জন করতে গিয়ে যদি কুলি হ'য়ে রাস্তা ঝাঁট দেই, তার মধ্যে দৈন্য নেই, কিন্তু যারা আমার আত্মাকে ছোট ক'রে দেবে, আমার মনের স্ফূর্ত্তি নষ্ট ক'রে—গোলামী কি তা হাড়ে হাড়ে বুঝবে—আমি তাদের কাছে আর যাব না—শতদল আমাকে মাপ কর—আমাকে ও পথে যেতে বোল না।"

এমন সময় আফিসের পিয়ন দীনদয়াল সিং সাহেবের একখানি চিঠি নিয়ে যোগেশবাবুর সঙ্গে দেখা করল।

সেদিন কার্য্যত্যাগ-পত্রখানি সাহেবের টেবিলে রেখে যোগেশবাবু চ'লে এলে,—সাহেবেরা তাঁর সম্বন্ধে পরামর্শ আরম্ভ করলেন। ফ্রেঞ্চ সাহেব বল্লেন "এরূপ বেয়াদবী অমার্জ্জনীয়,—এখন এঁর পেন্সন পাওয়ার সময় হয়েছে, কাজ ভাল করলে যা বেতন, আমাদের কোম্পানি পুরোপুরি তাই কখনও কখনও পেন্সন দিয়া থাকেন। এই লোকটার বয়স এখনও কম, তবু আমরা হয়ত একে শ'দেড়েক টাকা পেন্সন দিতে পার্ত্তুম, কিন্তু এর ব্যবহারের জঘন্যতা আপনারা দেখলেন—এখন কি কর্ত্তে হবে, তার পরামর্শ করা যাক্।"

বেরী বল্লেন, "পরামর্শ আর কি—কাজে তো এস্তাফা দিয়েছে। ভেবেছে জন্সন্ সাহেবকে মুরুব্বি ধ'রে উপর থেকে ভাল পেন্সন বাগিয়ে নেবে। যদি তাঁকে লিখে ডিরেক্টারদের হাত করে শ দুই টাকা পেন্সন করে নিতে পারে, তবে এখন শরীর ভাল আছে অন্য কোনখানে ২০০। ২৫০ টাকার চাকুরী জুটিয়ে বেশ উপার্জ্জন করবে। জনসন সাহেবের সুপারিশি চিঠিতে অন্য কোনখানে কাজ পাওয়াও হয়ত কঠিন হবে না। কিন্তু আমরা তা' কিছুতেই হ'তে দেব না। আমরা ওঁকে প্রকাশ্যভাবে ডিসমিশ করে দিয়ে ডিরেকটারদের খুলে লিখব, কি ভীষণ ভাবে আজ এই সভায় লোকটা বেয়াদবী করেছে; আমাদের বোর্ডের সকলের দস্তখতি চিঠির পরে কিছুতেই ডিরেক্টরগণ পেন্সন মঞ্জুরী করবেন না। জন্সন্ সাহেব হাজার চেষ্টা করলেও এক্ষেত্রে কিছু করতে পারবেন না। তার পর আফিসে আফিসে ওর দুর্নীতির কথা লিখে একটা সারকুলার দেওয়া যাক্, যাতে করে এদেশে কোথায়ও কোন য়ুরোপীয় ফারমে আর কাজ না পায়। শুনেছি যোগেশের টাকাকড়ি কিছু নেই, ওর স্ত্রী নাকি ভয়ানক

বাবু—সব টাকা খরচ ক'রে মাসে মাসে ধার করে বেড়ায়। এ অবস্থায় শয়তানটা আচ্ছা জব্দ হয়ে যাবে।"

পিটার সাহেব বল্লেন "সে তো বুঝলুম, কিন্তু আপনারা কি মনে করেছেন, যোগেশ চুপ করে ব'সে থাক্‌বে ? সে যা' যা' বলে গেছে, তা হয়ত সামনের মেলে লিখে সোজাসুজি সমস্ত অবস্থা ডিরেকটারদের কাছে জানাবে। আপনারা তো জানেন—ডিরেক্টরদের অন্যতম রবার্টসন সাহেবের ভাব ফ্রেঞ্চ সাহেবের উপর ভাল নয়। এই সকল অভিযোগ যার মধ্যে যোগেশ কাঁদুনী গেয়ে ফ্রেঞ্চ সাহেব-কৃত অপমানের কথা লিখ্‌বে, তা নিয়ে রবার্টসন্ সাহেব বিলক্ষণ নাড়াচাড়া দেবেন; জন্‌সন্ সাহেব বাতরোগে কাতর, তবুও লাঠিভর করে বিছানা হ'তে উঠে গিয়ে যোগেশের প্রত্যেক অভিযোগ সমর্থন কর'বেন। ফল কি দাঁড়াবে জানিনা,—হয়ত যোগেশ প্রশ্রয় পাবেনা, কিন্তু ডিরেক্‌টারদের আফিসে ফ্রেঞ্চ সাহেবের বিরুদ্ধে বিলক্ষণ একটি অস্ত্র শাণিত হয়ে থাক্‌বে।

"এ ছাড়া আরও ভাব্‌বার বিষয় আছে, যোগেশ যেরূপ দুষ্ট, সে কি শুধু এক'রেই থাম্‌বে। কালই বঙ্গ-ইঙ্গ কাগজগুলিতে এই সকল লিখে ছড়া কাট্‌তে থাক্‌বে, তাতে এই কোম্পানির দুর্নাম হবে, বঙ্গ-পাব্লিক প্রতিবাদ সভা আহ্বান করবে, হয়ত ডিরেক্টরদের তারাও চিঠি পাঠাবে। এদিকে লর্ডকার্জ্জনের সময় থেকে দেশীয় লোকদের উপর সাধারণতঃ সাহেবেরা যদি কোনরূপ অভদ্র ব্যবহার করেন, তবে তজ্জন্যও গোপনে গোপনে গুঁতো খেতে হয়। মোটকথা এই ব্যাপার নিয়ে একটা হৈ চৈ সৃষ্টি করা উচিত কিনা, আপনারা ভেবে দেখুন।"

বেরী—"আপনি কি উপদেশ দেন ?" পিটার—"আমি বলি, ওকে লেখা যাক্ তোমার দুর্নীত ব্যবহার সত্ত্বেও ফ্রেঞ্চ সাহেব তোমাকে ১৫০৲ টাকা পেন্সন মঞ্জুর ক'রতে প্রস্তুত আছেন, তুমি তোমার কার্য্যত্যাগ পত্র

প্রত্যাহার ক’রে লিখ যে তুমি অক্ষম হয়ে কাজ ছাড়্‌চ, এবং পেন্সন নিতে ইচ্ছা কর। তবে তোমাকে এই সর্ত্তে আবদ্ধ হ’তে হবে যে, তুমি ঘুণাক্ষরেও ফ্রেঞ্চ সাহেবের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবেনা, এবং আফিসের নিন্দাবাদ ক’রে বেড়াবে না। যদি আমরা জান্‌তে পারি যে, তুমি পুনরায় দুর্নীতি উক্তি দ্বারা সেই সকল মিথ্যা কথা রটনা কচ্ছ—তবে তোমার পেন্সন বন্ধ হ’য়ে যাবে।”

এই কথায় ফ্রেঞ্চ সাহেবের দলের লোকেরা ভয়ানক তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করে দিলেন। “নেটিভ বেটা প্রকাশ্যভাবে যা’ তা’ করে গালাগালি দিয়ে গেল। তাকে ঘোড়ার চাবুকের কয়েক ঘা কষে মেরে—এই আফিস হ’তে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত, তা’ না করে যেচে শিরোপা দিয়া তাকে বিদায় করতে হবে! এরূপ অপমান কি ক’রে সওয়া যায়?”

আর কেউ বুঝুক আর না বুঝুক, যার ঘা’ সে নিশ্চয়ই বোঝে। ফ্রেঞ্চ তাঁর, অবস্থাটি বেশ উপলব্ধি করেছিলেন। এ বিষয়ে গোলমাল উপস্থিত হ’লে যে তাঁকে অনেকটা কৈফিয়তের নীচে পড়তে হবে—এটা তার বুঝ্‌তে বাকী ছিল না। অত্যাচারী স্বভাবতঃই ভীরু হয়, ফ্রেঞ্চ সাহেব ভয় খেয়ে গিয়েছিলেন, তিনি বল্লেন—

“আমরা খ্রীষ্টান, অপরাধীকে আমরা ক্ষমা কর্‌তে জানি। আপনারা জানেন কি না জানি না, প্রথম জীবনটায় আমি মিসনারী ছিলাম। এ লোকটা যদিও ভয়ঙ্কর পাজি, তথাপি যা’ কিছু নিন্দা করেছে—তা প্রধানতঃ আমাকে। আমি প্রাণের সঙ্গে একে ক্ষমা করলুম। আপনারা উত্তেজিত হবেন না, আমার প্রতি আপনাদের ভালবাসার এই প্রগাঢ় উদাহরণ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। পিটার সাহেব যা বল্লেন, আমি তাই করব। যোগেশ আমাকে গালাগালি দিয়েছে, আমি তার চাইতে কত বড়, সেই নেটিব

সিগারটা বুঝে নিক্—আমি তার পেন্সনের জন্য সুপারিশ করব, যদি পিটারের কথা মত সর্ত্তে সে আবদ্ধ হয়। আমার সে কি করবে? সে একটা কুকুর—আমার ভয় কি? আমি শুধু দয়াগুণে এবং পিটারের ন্যায় উৎকৃষ্ট বন্ধুর মর্য্যাদা রাখ্‌বার জন্য তার উপদেশ গ্রহণ করলুম।"

তাঁর দয়া দেখে বেরী প্রমুখ তদীয় দলের লোকেরা অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইল। *পিটার একটু মুখ টিপে হেসে সেই সভাগৃহ হ'তে বের হয়ে গেলেন।*

সাহেব হয়ত তাকে ডেকে নিয়ে অফিসে দুঘা' জুতো মেরে সর্ব্বসমক্ষে অপমান করবে—এটি তার নিমন্ত্রণ চিটি,—এই মনে করে যোগেশ বাবু সাহেবের পত্র পড়্‌তে সুরু কল্লেন—তা'তে লিখিত ছিল,—

"প্রিয় যোগেশ,

তুমি কাল যে সকল কথা বলেছ—তা অত্যন্ত অসঙ্গত। সাহেবেরা সকলেই ভারি চটে গেছিলেন, তাঁরা তোমাকে মেরে তাড়াবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার প্রকৃতি তুমি বুঝ্‌তে পার নাই। আমার ক্ষমা কত বড়, তা' তুমি বুঝতে পারবে। তুমি যদি তোমার কার্য্যত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করে নিজের অক্ষমতা জানিয়ে পেন্সনের দরখাস্ত কর, এবং তোমার দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে লিখ যে আমার এবং আমার আফিসের দোষ কীর্ত্তন ক'রে তুমি বেড়াবে না,—এ করলে তোমার যা'তে মাসিক ১৫০৲ টাকা পেন্সন হয়, তার চেষ্টা আমি করব এবং তুমি নিশ্চয়ই তা পাবে। কিন্তু যদি কোন দিন জান্‌তে পাই যে, তুমি আমাদের নিন্দা ক'রে বেড়াচ্ছ, তবে তখনি তোমার পেন্সন বন্ধ হয়ে যাবে।

বশম্বদ

এ, ডি, ফ্রেঞ্চ

শতদল সাহেবের চিঠি পেয়ে চীৎকার ক'রে বলে উঠ্লেন। "দেখ্‌ছ, সাহেব কত দয়ালু! তুমি নিজে 'যা' তা বলে তাঁকে গালাগালি করে এসেছ, অথচ তিনি অযাচিত ভাবে তোমাকে পেন্সন দিতে চাচ্ছেন, যাও তাঁর হাতে পায় ধ'রে প'ড়—নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে কাজ দেবেন, এতে আর সন্দেহ নাই। ১৫০৲ টাকার পেন্সনে আমাদের সংসার কি করে চল্‌বে?"

যোগেশ,—"তুমি আর এ বিষয়ে মাথা ঘামিও না, শতদল, বিনয় ক'রে বল্‌ছি। সাহেব আমার অভিযোগগুলিতে নিশ্চয়ই ভয় খেয়ে গেছে। সহজে বাঁক্‌বার লোক ফ্রেঞ্চ নন, ওঁর পায়ে ধর্‌লে মাথায় পদাঘাত, ঘাড়ে ধর্‌লে তবে অন্যরূপ হ'তে পারে। তুমি আমায় বাধা দিও না, আমি যা' ভাল বুঝ্‌ব তাই লিখ্‌ব। আমার ভিতরে দেবতা আসন পেতে ব'সে উপদেশ দিচ্ছেন, আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। আমি আর কারো উপদেশ নেব না।" এই ব'লে চেয়ারখানা টেবিলের দিকে সরিয়ে নিয়ে তিনি সাহেবকে নিম্নলিখিত উত্তরটি লিখ্‌লেন :—

"*প্রিয় মহাশয়, যে আফিসে আমার হাড় অপমানে জ্বলে গেছে, সে আফিসের সঙ্গে আর আমার কোন সম্পর্ক রাখা আমি ইচ্ছা করি না। ভগবান আপনার মত অত্যাচারী, বিচারহীন, নির্দ্দয় ব্যক্তির হাত থেকে দান নেওয়ার অপমান হ'তে আমায় রক্ষা করুন, আমি কোন পেন্সনের প্রার্থী নই। আমি মুটে মজুর হয়ে খেটে খাব। অপমানের দান গ্রহণ কর্‌ব না।*

আপনি নির্ভয় হউন, আমি প্রাণান্তেও বাইরে আপনার কথা নিয়ে আলোচনা কর্‌ব না। কোন খবরের কাগজে এ কথা উঠবে না, এবং ডিরেকটারদের কাছেও পত্র যাবে না। আমি ভদ্রলোক,—আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করে আশ্বস্ত হউন, যে আফিস এতকাল আমার

অন্ন বস্ত্র জুগিয়েছে, আমি নেমকহারামী ক'রে সেই আফিসের নিন্দা করে বেড়াব না। আমি এখনও সবল, সুস্থকায়, আমি অক্ষমতার ভাণ ক'রে পেন্সনের দাবী কর্‌তে প্রস্তুত নই।

বশম্বদ

যোগেশচন্দ্র রায়।"

পত্রখানি লিখে তিনি একবার শতদলকে পড়তে দিলেন। শতদল মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন। দীনদয়াল সিং পত্রের উত্তর নিয়ে চ'লে গেল।

৮

বারুইপুর থেকে বড় বড় মানকচু নিয়ে এসে যোগেশবাবু সেয়ালদহে বিক্রয় করেন। একখানি গামছা কোমরে বাঁধা; পায়ে একজোড়া চটি, কাঁধে একখানি চাদর—মুটে মজুরও খরিদদারদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা, ডাকা-হাঁকি, ভোর ৫টা হ'তে রাত ৯টা পর্য্যন্ত,—একটুকু বিশ্রাম নেই। পুঁজি পাটা বেশী নেই। শতদল রাগ ক'রে বাপের বাড়ী চলে গেছেন, বাড়ীটা ছেড়ে দিতে হয়েছে। শতদল রাগ করে তাঁর সঙ্গে তিনদিন কথা কন নি। বিদায় নেওয়ার সময় শুধু কাছে এসে নত মস্তকে দাঁড়াল—বড় সাধের ১৭ বৎসরের ছেলে বিপিন। তার মাথায় হাত রেখে যোগেশ বাবু বল্লেন, "বিপিন তোরা চল্লি, এখন আমি কড়ার ভিখারী, ফেরীওয়ালা—আমার দেবার কিছু নেই; আছে এই শুধু হাতে মাথা ছোঁয়া আশীর্ব্বাদ, তাই দিয়ে গেলুম। তোর পিতা দীন হয়েছে, হীন হয় নি। আত্মার বলেই লোক বলীয়ান হয়, অর্থ বলে নয়। দারিদ্র্য তাকে পীড়া দিতে পারে না—যার অভাব অল্প। তুই ভগবানের আশীর্ব্বাদে ছোটবেলা হ'তে অভাব বাড়াস্ নাই এই জন্য তুই প্রকৃত

বলবান, অভাব বাড়ালে তার শেষ নাই। সে ধনবান হ'লেও চির অভাব গ্রস্ত, এই হিসাবে দরিদ্র। তুই আমার কাঙ্গাল ছেলে—তুই বিলাসের মধ্যে পড়ে সংযমী হয়েছিস্, আমার একটি কথা রাখিস, কখনও চাকুরী করিস্ না। ভগবান ভিন্ন আর কাউকে প্রভু বলে মেনে নিস না। স্পর্দ্ধা না করে সবল হবি, মৃদু হয়েও তেজস্বী হবি, সময়ের অপব্যয় করিস না, তা' হলেই তুই প্রকৃত ধনী হবি।" পায়ের ধূলো নিতে গিয়ে পিতার পদে বিপিনের কয়েক ফোঁটা চোখের জল পড়ল। সুন্দরী ও রজনীগন্ধার গণ্ডে দুটো চুমো দিয়ে যোগেশ এক হাতে উদ্গত অশ্রু মুছ্‌তে মুছ্‌তে বাড়ীতে এক দিক্ দিয়ে বের হয়ে গেলেন, অপর দিকে শতদলবাসিনী অবগুণ্ঠনবতী হয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁরও জিনিসপত্র সহ গাড়ী প্রস্তুত ছিল—তিনি ভিকনূলালকে সঙ্গে করে পিত্রালয় রঘুপুরের দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

৯

রজনী চৌধুরী তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজীবকে একটি পরমাসুন্দরী জমিদারের কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন।

এই জমিদারের নাম ছিল শিবচন্দ্র মজুমদার—তাঁর সম্পত্তির আয় ছিল বার্ষিক ১২০০০ টাকা। শিবচন্দ্রের মাত্র একটি পুত্র চারুচন্দ্র। ১২ শ বর্ষ বয়সে চারু একদিন সন্ধ্যাকালে নদীর তীরে বেড়াতে গিয়ে নিরুদ্দেশ হ'য়ে যায়। শিবচন্দ্র ও রজনী চৌধুরী ছিলেন আশৈশব বন্ধু, উভয়ের প্রকৃতি কতকটা একরকম ছিল। শৈশবের সৌহার্দ্দ্য প্রগাঢ় করিবার জন্য শিবচন্দ্র তাঁহার কন্যা লবঙ্গলতাকে রজনী চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ-পুত্র রাজীবের হস্তে সম্প্রদান করেন। একমাত্র পুত্র নিরুদ্দেশ হওয়ার পরে শিবচন্দ্রকে কেউ বেশী শোকার্ত্ত হ'তে দেখে নাই; যদিও বহুদিন পূর্ব্বে যখন তাঁর স্ত্রীবিয়োগ

ঘটে, তখন তিনি শোকাচ্ছন্ন হয়ে প্রায় উন্মাদের মত হ'য়েছিলেন। চারুকে পাওয়া গেল না, শিবচন্দ্র তথাপি ষ্টেটের কাজ কর্ম্ম দেখ্‌তে কিছু মাত্র ত্রুটি করতেন না। লোকে বল্‌ত "মেয়ে লবঙ্গলতা তো জমিদারের হাতে পড়েছে, এই রত্নপুরের রাজপ্রাসাদে এবার বাতি জ্বালাবে কে? শিবুমজুমদারের মৃত্যুর পরে তো এ বাড়ীতে শেয়াল কাঁদবে।" এ সকল কথায় মজুমদার দৃকপাত করতেন না। বাড়ীটি বছর বছর রং ফিরিয়ে নূতনের মত ঝক্‌ঝকে করে রাখ্‌তেন। যেমন জোরে উৎসব চলেছিল, বারমাসে তের পার্ব্বণ তেমনি জোরে চল্‌তে লাগ্‌ল। বাড়ীর কোন জায়গার একটি চুণ সুরকি কিম্বা ইট খস্‌লে সে জায়গা তখনই মেরামত করা হ'ত। বরঞ্চ সেই সকল জায়গা নূতন নূতন শিল্পাদর্শে আরও বেশী শোভনীয় হ'য়ে উঠ্‌ত। লোকে বলত "বাড়ী ঘর তো বিমল কব্‌রেজের খপ্পরে যেয়ে পড়বে,—বুড় মিছামিছি অর্থ ব্যয় করে বাড়ী সাজাচ্ছেন।" কেউ কেউ শিবু মজুমদারের সংসারাসক্তি দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করতেন, "একটি ছেলে চাঁদের মত,—তাও ভগবান সইলেন না, কিন্তু বুড়র আক্কেল দেখ— কোথায় এমন শোক পেয়ে বনবাসী কি তীর্থবাসী হবে, না আরও যেন বেশী ক'রে ঘর বাড়ী সাজান হচ্ছে,—যেন ছেলেটি বিয়ে করে বউ নিয়ে বাড়ীতে আস্‌ছেন।" কোন কোন দুষ্ট লোক এমন কথাও বলতে ছাড়ত না যে, চারুর জন্য যতটা খোঁজ করার দরকার তা কই করা হৈল? অন্য কেউ এই বার বৎসরের একটি দিনও হাল ছেড়ে দিয়ে থাকৃত না, কিন্তু শিবু মজুমদারের এত টাকাকড়ি থাকা সত্ত্বেও সেই প্রথম বছরটা সামান্য ভাবে খোঁজ খবর ক'রে একবারে চুপ চাপ আছেন। এদিকে একটি মাত্র বাতী নিবে গেছে, তবু আঁধার ঘর সাজাতে লেগে গেছেন।" কেউ কেউ আবার প্রশংসা ক'রে বলত "দেখ মজুমদার মহাশয়কে,—এত বড় শোকটা পেয়েও কেমন পাহাড়ের মত অটল হ'য়ে আছেন। কেউ তো একথা

ব'লতে পারবেন না যে ; শিবু মজুমদার নির্ম্মম ব্যক্তি। অল্প বয়সে ছেলেটির মা মারা যায়—তার পর থেকে কি স্নেহে না এই ছেলেটা ও মেয়েকে মানুষ করেছিলেন, তা' কে না দেখেছে ? এত বড় লোক, ইচ্ছা ক'রলে ত দুটো নার্স এনে চাকর বাকর দিয়ে এদের লালন পালন করতে পারতেন, কিন্তু নিজে সারা রাত জেগে মায়ের মতন করে ছেলে মেয়েকে মানুষ ক'রেছেন। তার পর মেয়েকে বিয়ে দিলেন, তাঁকে রঘুপুরে নিয়ে গেল, আর এদিকে চারু হারিয়ে গেল—হিমালয়ের মত নির্ব্বিকার পুরুষ—যেন কিছু হয় নাই, এমনই ভাবে সংসার চালাচ্ছেন। সেই যাত্রা, গান, কীর্ত্তন, মহোৎসব, লোকদের খাওয়ান-দাওয়ান—সেই উৎসবের সময় ঘরে ঘরে ঝাড় জ্বলে উঠছে, ছেলে বুড়য় মিলে আমোদ কচ্ছে, প্রত্যেক আমোদেই মজুমদার নিজে আগ্রহের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। অন্য কেউ হ'লে কেবল মালা টপ্‌কাত ও চোখের জল ফেল্‌ত, কিন্তু এঁর যদি কোন কষ্ট হয়ে থাকে তা' পরম বিরাগের সঙ্গে মন হ'তে ধুয়ে মুছে ফেলে ইনি বাইরের সরঞ্জাম ঠিক রেখেছেন। কারু বুঝবার যো' নেই—যে ইনি এত বড় শোকটা পেয়েছেন—একি কম মনের বলের কথা ?"

মজুমদার মহাশয় এই সকল নিন্দা বা প্রশংসার কথায় কর্ণপাত করতেন্ না। তবে হঠাৎ মাঝে মাঝে কলিকাতায় যেতেন, ঝড় বৃষ্টি তুফান এমন কি নিজের অসুখ বিসুখ গণ্য করতেন না, যেদিন যাবেন বলতেন,—সেদিন যাওয়া চাইই। আর মাঝে মাঝে রঘুপুর গিয়ে বেহাই রজনী চৌধুরীর সঙ্গে ঘরের দোর আগলিয়ে দুই তিন ঘণ্টা ধ'রে কি পরামর্শ করতেন্। তাঁর শেষ জীবনের খানিক খানিকটা একটা প্রহেলিকার মত বোধ হ'ত, এ জন্য নানা ভাবে নানা জনে তার ব্যাখ্যা করত।

এই ভাবে মৃত্যুর এক মাস পূর্ব্বে তিনি কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা

করিয়েছিলেন। এই এক মাস রজনী চৌধুরী তাঁর সঙ্গে ছিলেন, আর পাশের মেসের দুই একটি ছেলে দিন রাত ক'রে তার শুশ্রূষা করেছিল,—বিশেষ স্নেহময় বলে একটি ছেলে আহার নিদ্রা ছেড়ে দিয়ে তাঁর শয্যার পার্শ্বে ছিল, এবং তিনি প্রাণত্যাগ করার পর সাশ্রুনেত্রে শ্মশান ঘাটে তার দাহকার্য্য সম্পাদনে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত ছিল।

লবঙ্গলতা দেব-প্রতিম শ্বশুর পেয়েছিল, কিন্তু তার স্বামীর ব্যবহারে সে প্রথম হইতেই বড় শঙ্কটের মধ্যে প'ড়ে গেছ্‌ল। পাড়াগেঁয়ে জমীদারের বাড়ী, লবঙ্গলতা ছিল, একটি কুঁড়ি ফুলের মত মৃদু-স্বভাব। রাজীব তখন সবে এফ, এ ক্লাশে উঠেছে, তাঁর ইচ্ছা যে, লবঙ্গ ইংরেজী পড়ে, 'সু' পায়ে রাস্তায় বেড়াতে বা'র হয়, হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান করে। সলজ্জ বধূটির এই সমস্যাটি রজনী চৌধুরী বেশ বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি তার ইংরেজী পড়া ও হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান শিখ্‌বার সুব্যবস্থা ক'রে দিলেন। তিনি প্রাচীন হ'লেও নব্য সম্প্রদায়ের ভাবগুলি তাঁর বেশ জানা ছিল, এবং শিক্ষা যে কোন কালেই মানুষের উন্নতির অন্তরায় হ'তে পারে না, এটি তিনি সরল মনে বিশ্বাস করতেন। তিনি শতদলকে ইংরাজী শিক্ষা দিতেছিলেন, এখন বধূটির জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু তাঁর গিন্নী—পুত্রবধূ 'পাম্প শূ' পায়ে হাটে বাজারে রাস্তায় বেড়াবেন, ইহাতে কিছুতেই সম্মতি দিতে পার্‌লেন না। পাড়াগাঁয়ে তো একটা সমাজ আছে, তাঁরা তো সমাজপতি—তার উপর সে গাঁয় বহু বামুন-বৈষ্ণের বাস—এসকল সহুরে রকম-সকম এখানে কি ক'রে চালান যায়? মায়ের ভয়ে রাজীবকে অনেকটা নিরস্ত হ'তে হ'ল। কিন্তু মাতার মৃত্যুর পর রাজীব তাঁর যত খেয়াল, তা ভাল ক'রে চালাবার সুযোগটার যেন একটা রাজপথ পেলেন। লবঙ্গলতার হাত নিজ কাঁধের ভিতর পুরে হ্যাটকোট পরে তাকে পম্প সূ পরিয়ে, ব্রাহ্মিকার বেশে সজ্জিত করে হাটে পথে ঘুরতে লাগলেন। বাড়ীতে

যখন পূজো হ'ত, তখন নিজেতো দুর্গা মণ্ডপে উপস্থিত হতেনই না, বউকে ঠাকুর প্রণাম করতে বারণ ক'রে দিলেন। রজনী, চৌধুরী একদিন স্বয়ং বউএর ঘরের কাছে এসে বল্লেন "বউ, ঠাকুরের নির্ম্মাল্য নিয়ে যাও,—" তখন নবজ জোর করে বা'র হচ্ছিলেন, কিন্তু রাজীব তার আঁচল ধরে টানাটানি করতে লাগল। এই ব্যবহারে বউটি লজ্জায় ম'রে গেল— তার মুখখানি ভয়ে ও দুঃখে মড়ার মত শাদা হয়ে গেল। রজনী চৌধুরী এই ধ্বস্তাধ্বস্তির আভাস টের পেয়ে উচ্চৈঃস্বরে বল্লেন "না, বউ মা, দরকার নেই, আমি তোমার নির্ম্মাল্য ঠাকুর ঘরে রেখে গেলুম, বাসি কাপড়ে তা' ছোঁয়ার দরকার নেই, তুমি শাড়ী বদ্‌লিয়ে শুদ্ধ হ'য়ে এটি অবসর মত মাথায় ধারণ কো'র।"

রজনী চৌধুরী পুত্রের ব্যবহারে বিরক্ত হ'লেও বাইরে তার মনোভাব ব্যক্ত কর্‌তেন না, তিনি বুঝ্‌লেন, একটা কাল এসেছে—তা মত্ত হাতীর মত পুরাতন পথটা পদদলিত ক'রে, সব ভেঙ্গে চুরে নিজের ইচ্ছা মত চলবে। একাল আর সেকালে অনেক তফাৎ, চোখের জলে গণ্ড ভাসিয়ে দিলে বা হা হুতাশ করলেও পুরাণা সমাজ আর পাওয়া যাবে না। এখন কি আসছে, তার প্রতীক্ষা করতে হবে। নূতন উচ্ছৃঙ্খল হ'তে পারে, সে ঠাকুর ঘরের নির্ম্মাল্য নৈবেদ্য ও হেঁসেলের ভাত একাকার করে ফেলে প্রাচীন শ্রদ্ধার মূলে কুঠারাঘাত করতে পারে, সে নূতনের হয় ত বোধ শোধ নাই। সে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে, সাপকে গলা টিপে ধরতে [illegible] পেতে পারে—কিন্তু তবু সে ঠেলে ফেলে দেবার বস্তু নয়, সেই এই ভাবী রাজ্যের মালিক। আমরা কোথায় চলে যাব তার ঠিকানা নাই। সেই নূতনই হবে মালিক, তাকে ঠেকান যাবে না, নড়ান যাবে না,—তার সঙ্গে হাতাহাতি সাজে না, তাকে বুঝতে চেষ্টা কর, যদি না পার—তবে নিজে বুঝতে চেষ্টা কর। নিজকে সব জান্তা মনে করে পুঁথি পত্র, ও শ্লোকের উপর

অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করে—শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি পাবার জন্য পা' বাড়িয়ে থেকো না,—শেষে ঠক্‌বে।

পুত্রের ব্যবহারে সময়ে সময়ে কষ্ট পেলেও তিনি কোন প্রতিবাদ করেন নি, এমন কি তাঁর মনে এমন কথাও হয়েছে, "কে জানে, ওরাই ঠিক কাজ কচ্ছে, না আমারই ধারণা ঠিক?" এই দ্বিধার মধ্যে থেকেও তিনি পুত্রবধূর লজ্জা ও উৎকণ্ঠায় নিজে লজ্জিত ও উৎকুণ্ঠিত হয়ে উঠ্‌তেন। লবঙ্গলতার সমবয়স্কা সাথী এবং গুরুজনদের সমাজে যে নিন্দিতা হ'তেন, অকারণ তাঁকে এই সকল কার্য্যের জন্য নিন্দাভাজন হ'তে হ'ত। তাঁর সম্বন্ধে সরলচিত্ত, অদূর-দর্শী চিন্তাহীন পাড়াগেঁয়ে মেয়েরা যে সকল মন্তব্য প্রকাশ কর্‌ত, তখন তার পদ্মের কুঁড়ির মত কোমল দুটি ঠোঁট শুকিয়ে উঠত, চোখ দুটি ত্রস্ত ও সজল হ'ত? দেখে বৃদ্ধ বড়ই আঘাত পেতেন, কিন্তু এক্ষেত্রে কি বল্‌বেন, যাকে বল্‌বেন, সে যদি তা না শোনে, তবে কি কর্‌বেন, এই দ্বিধার মধ্যে পড়ে তিনি নিজে কর্ত্তব্যের পথ ঠিক ধর্‌তে পার্ত্তেন না।"

কিন্তু শেষে বাড়াবাড়িটা একটা চরম সীমায় পৌছিল। সে বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে রাজীবের চারটি সহপাঠী রঘুপুরে এলেন। রাজীব এম-এ পাশ করে 'ল' পরীক্ষা দিয়েছেন। এই চারজন ছেলে তার সহপাঠী। তাদের সকলেরই ঘাড়ের চুল ছাটা, মুখে অষ্টপ্রহর চুরুট, চসমা চোখে, তারা বাড়ীতে আদ্দির পাঞ্জাবী ও স্লিপার পরে, বাইরে যেতে হ'লে হ্যাট কোট ট্রাউজার ও বুট পায়ে শিশ দিতে দিতে চলে; তারা ঠাকুর দেবতা দেখে নাক সিট্‌কোয়, ইংরেজীতে কথা বলে ও ছোট লোকের গন্ধ যে অঞ্চলে, সেখানে এসেন্স ভেজা রুমালে নাসারন্ধ্র বন্ধ ক'রে চলে, অথচ তারা দেশের সমস্ত লোকের জাগরণের চেষ্টায় সভা ক'রে বেড়ায়। তারা নিজেদের আত্মীয় স্বজন এমন কি, বাপ মাকেও "ড্যাম ফুল" ব'লে গালাগালি দেয়

অথচ বোম্বাই ও পাঞ্জাবের লোককে ডেকে এনে ভ্রাতৃভাব দেখায়। তারা সাহেবের কাসি, সাহেবের হাসি হ'তে সুরু করে,তাদের দুপা' ফাঁক করে দাঁড়াবার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত নকল করতে প্রাণান্ত চেষ্টা পায়, অথচ সভা সমিতিতে তারা ঘোর স্বদেশী। তারা ট্যাস ফিরিঙ্গির কওয়া বাজারে ইংরেজী বুলি গুলি পর্য্যন্ত অভ্যাস করে নিজেরা ধন্য মনে করে—এবং দেশী ভাষাকে প্রাণের সহিত ঘৃণা ক'রে অথচ তারা বক্তৃতা দেয় যে, দেশই তাদের সর্ব্বস্ব। তারা গোঁফ দুটি ছাট্‌তে ছাট্‌তে শেষ পর্য্যন্ত একটা কমা, সেমিকোলেন অথবা একটা ফড়িংএর মত পদার্থ টুকু বাকী রেখেছে —তা' দেখাচ্ছে যেন কোন ছাগলে দুর্ব্বাঘাষের সবটা খেতে যেয়ে একটুখানি বাকী রেখে চলে গেছে, এদিকে তারা টিকি দেখ্‌লে জ্বলে উঠে, তারা পোপকেটিপেটল কোথায় তা জানে, এবং লণ্ডনের হোটেল ওয়ালীদের নাম পর্য্যন্ত টুকে রাখে, অথচ নিজের প্রতিবেশী ও নিজের বাড়ীর ঠাকুরের নামটি পর্য্যন্ত জানে না। তারা নিজের বাগানের গোলাপ বেলা, ও মল্লিকার চারাগুলি তুলে ফেলে সে'খানে টবে ক'রে কচু ও থানকুনি পাতা—ল্যাটিন নামে পরিচয় দিয়ে গৌরবের সহিত প্রতিষ্ঠিত ক'রে থাকে।

সব চাইতে তাদের বাহাদুরী হচ্ছে পুরুষ ও স্ত্রীজাতির সাম্যবাদ প্রচারে। তারা পর্দ্দার ঘোর বিরোধী ও স্ত্রীপুরুষের অবাধ-মিলনের পক্ষপাতী।

এ বিষয়ের নেতা ছিলেন মিঃ এস, দাস। এখন রাজীব এসে লবঙ্গকে ধ'রে পড়ল, "তোমায় এঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতেই হবে, তা' যদি না ব'ল, তবে কলকাতা সহরে আর আমি মুখ দেখাতে পারব না।" লবঙ্গ বল্লেন, "সে আমি কিছুতেই পার্‌ব না, আমার গলাটা কেটে ফেল্লেও তা আমাকে দিয়ে হ'বে না।" এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তুমুল

ঝগড়া চল্ল। যদিও লবঙ্গের সুরটি ছিল অতি কোমল, তা ঘরের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে অপরের কানে পোঁছা একরূপ অসম্ভব ছিল, কিন্তু উত্তেজনার সময় রাজীবের গলা গিয়ে সপ্তমে চড়্‌ত। তার কথা পার্শ্ববর্ত্তী ঘরের লোকেরা স্পষ্ট শুন্‌তে পেতেন। এই ভাবে রজনী চৌধুরী মহাশয় ব্যাপারটি বেশ বুঝতে পার্‌লেন। কারণ বিবাদের ক্ষেত্রে এক পক্ষের সব কথা শুন্‌তে পেলে অপর পক্ষের কথা অনুমান ক'রে নেওয়া অতি সহজ হয়।

এই ঘটনা যে অচিরে খুব একটা অপ্রীতিকর ফল উৎপন্ন করবে, চৌধুরী মহাশয়ের তা' বুঝতে বাকী রইল না। আর তো চুপ ক'রে থাকা যায় না। তখন তিনি একদিন প্রাতে টেলিগ্রাম ক'রে স্নেহময় গুপ্ত নামে কলিকাতার কোন মেস হ'তে একটি ছেলেকে রঘুপুরে নিয়ে আস্‌লেন। পাঠকের মনে থাকতে পারে এই স্নেহময় গুপ্ত—লবঙ্গের পিতার মৃত্যুকালে তাঁর অনেক সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন, স্নেহময় ইউনিভার্সিটিতে ইণ্ডিয়ান হিষ্টরি ও এনাসিয়েণ্ট কালচারে এম্‌, এ পড়্‌তেন। এখন গ্রীষ্মকালের ছুটি।

যদিও স্নেহময়ের পোষাক পরিচ্ছদ নিতান্ত অনাড়ম্বর ও দেশী ধরণের ছিল, তথাপি তাঁর অসীম সৌজন্য ও মৃদু স্বভাবের গুণে তিনি অতি অল্প-সময়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ সখার মধ্যে একটি শ্রদ্ধেয় আসন গ্রহণ করলেন। স্নেহময় রোজই দুই এক ঘণ্টা রজনী চৌধুরীর সঙ্গে এক ঘরে আলাপ করতেন্‌, সে সময়ে কেউ উপস্থিত হ'লে তারা উভয়েই চুপ করতেন। স্নেহময়ের প্রভাব সেই বাড়ীতে এতটা হ'ল যে, লবঙ্গও তাঁর আহার ও অপরাপর বিষয়ের সুবিধার জন্য বিশেষ ব্যস্ততা দেখাতেন।

একদিন রাজীব বল্লে, লবঙ্গ, এক মাসের আর ১০টি দিন বাকী,

আমি এঁদেরে ভাঁড়িয়ে রেখেছি, এই বলে যে তোমার শরীর ভাল নয়। ২।১ দিন পরে তোমার সঙ্গে তাদের আলাপ করিয়ে দেব। ২।১ দিন ক'রে অনেক দিন কেটে গেছে, এখন তোমার ঘরে আমি তাঁদের ডেকে আনব, কি আনব না। এ বিষয়ে আমি কোন বাধা মানব না, তা যদি কবুল না ক'র—তবে তোমার সঙ্গে আমার সমস্ত সম্বন্ধ শেষ হ'ল, জানবে।"

লবঙ্গলতা কাঁদতে লাগলেন। রাজীব বল্লেন "কাঁদই আর যাই কর, আমি তোমাকে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য করব। তাঁরা ভদ্র সন্তান, আমার বন্ধু, শিক্ষিত—এ অবস্থায় মুখের কথাটী শুনলে যদি তাঁরা খুসী হন, তবে তোমার ক্ষতি কি?"

লবঙ্গ—"লজ্জা ব'লে তো একটা জিনিষ আছে, আমার যদি লজ্জা হয়, তবে কি করব? তুমিই তো স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি তোমার মতলব্ চালাবে, এতে আমার স্বাধীনতা রইল কোথায়?"

রাজীব। "জানি গো জানি, আমার বাবা তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে ঘোরতর তার্কিক ক'রে তুলেছেন; এখন তর্করত্ন মহাশয়, কাল যদি আপনি ওদের সঙ্গে কথা না বলেন, তবে আমার এ ঘরে আর মহাশয়ার কোন স্থান হবে না, আপনার এখান থেকে তল্পীতল্পা বেঁধে পিত্রালয়ে যেতে হবে। জানি গো, তোমার পিতা ছিলেন জমিদার, এখন পিতার বিষয়টাও তুমি পেতে পার, কিন্তু আমাকে আর পাবে না। আমি তোমাকে ভাব্‌বার জন্য আজ সারা রাত্রিটা ও কাল রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত সময় দিলুম—এর পরে তাদের পালা আসবে, তখন তোমার উপর দস্তুর মত দৌরাত্ম্য আরম্ভ হবে।

রাজীবের প্রত্যেকটি কথা অতি স্পষ্টভাবে রজনী চৌধুরীর কাণে

গেল। তিনি সারা রাত হাঁসপাস করে কাটিয়ে প্রাতঃকালে বউকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন।

অবগুণ্ঠনটা কেবল সীমন্ত ছুঁয়ে, আঁধারের ডগায় চাঁদের আলোটুকুর মত ছোট্ট সিন্দুর ফোঁটাটিকে উজ্জল করে দেখাচ্ছিল; পূর্ব্বরাত্রের ঘোর সমস্যায় লবঙ্গের মুখখানি শুকিয়ে গেছ্‌ল। রজনীবাবু বল্লেন, "বউমা, তুমি ওদের সঙ্গে কথা কইও, কথা বল্লে কি হবে? সেই দলে স্নেহ থাক্‌বে, তোমার ভয় কি? লোকের সঙ্গে লোকের কথা বল্লেই কোন দোষ হয় না,—এ ব্যাপার কতদুর গড়ায়, তা দেখবার লোক আছে, আমি অভয় দিচ্ছি। মিছামিছি আর যন্ত্রণা ভোগ ক'র না। এ ব্যাপার এখানেই তো সে থাম্‌তে দেবে না, যাতে লোকে একটা হৈ চৈ শুনে তামাসা দেখতে না আসে—তার ব্যবস্থা করতে হ'বে। তুমি অবাধে তাঁদের সঙ্গে কথা ব'ল, এটি আমার আজ্ঞা ব'লে জে'ন।"

লবঙ্গ ম্লান হাসি হেসে শ্বশুরের পদধূলি নিয়ে ঘর হ'তে বাইর হ'য়ে এলেন।

১০

একদিন সজল চোখে দরজার একটা পাট ধ'রে লবঙ্গ তার শ্বশুরের ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, দেখে তিনি তাড়াতাড়ি বের হয়ে এলেন। সেই ঘরের কাছে বারেণ্ডাটা নিরালা, দুজনে সেখানে দাঁড়ালেন। রজনী বাবু জিজ্ঞাসা করলেন "কি হয়েছে?" নতমুখে লবঙ্গ বল্লেন "আমার সঙ্গে এস, দাস যে ভাবে কথা বলেন, তা আমার মোটেই ভাল লাগ্‌ছে না। আজ উনি বলছেন আমাকে একা তাঁর সঙ্গে খানিকটা কথা বল্‌তে হবে, তখন আর কেউ থাক্‌বে না। আমি দাসের সঙ্গে একা কিছুতেই এক ঘরে থাকতে পারব না।"

"তাকে ভাল করে বুঝিয়ে বল যে এটা তার উচিত নয়,—তবুও যদি সে বাড়াবাড়ি করে, তবে দুই একদিন পরে যা হয় তুমি ভেবে বলবে, এই ভাবে খানিকটা সময় থামিয়ে রাখতে চেষ্টা ক'র।"

সেই দিন রজনী চৌধুরী রাজীবকে ডেকে পাঠিয়ে বল্লেন—"বউমাকে তুমি এদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে দিয়েছ?"

"আজ্ঞা হাঁ, তাতে ক্ষতি কি?"

"এতে যে কতটা নিন্দে হচ্ছে, তা বুঝ্‌তে পার?"

"আমাদের সমাজের এখন সংস্কারের দরকার, আমরা সংস্কারকের ব্রত গ্রহণ করেছি—আমরা তা, না কল্লে দেশ উচ্ছন্ন যাবে। আর সংস্কারকের পক্ষে নিন্দা প্রশংসার দিকে চেয়ে থাকা কি উচিত? আর সভ্যজগতে নরনারীর সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, তখন কি আমরা পর্দ্দায় ঘিরে বউগুলিকে চাবিবন্ধ করে রাখব? বহুদিনের সংস্কারের দরুণ এটা যে কতদুর অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা' যদি আপনার মত লোকেও না বুঝতে পারেন, তবে আর আমি কি কইব? আপনিই তো উচ্চ শিক্ষার পক্ষপাতী হয়ে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন, এখন গাছ পুঁতে তারপর ফল দেখে ভয় কর্‌লে চল্‌বে কেন?"

"স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকারের কথা এখন তোলবার দরকার নেইকো। তাদের কার কি সামর্থ্য আছে, সেটা সূক্ষ্মভাবে বিচার ক'রে —সে সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। কিন্তু তাদের অবাধ মিলন তো কখনই শুভ ফলপ্রদ হ'তে পারেনা।"

"বিলাতে তো সেরূপ অবাধ মিলন আছে—তাতে তো কোন অনিষ্টকর ফল হয় নি, অন্ততঃ আমাদের সমাজ হ'তে তাদের সমাজের অবস্থা খুবই ভাল বল্‌তে হবে।"

"বিলাতের কথা যা' শুনেছি, তাতে খুব বড় লোক ও অধস্তন সমাজ

—ইহাদের মধ্যে ব্যভিচার আছে। কিন্তু মধ্যবৃত্ত সমাজ—যা হ'চ্ছে একটা জাতির প্রধান মেরুদণ্ড, তাদের মধ্যে অবাধ মিলন নাই।"

"কোন্ জাতি কি কচ্ছে—সে কথা না তুলে এইরূপ মিলনের মধ্যে কি দোষ থাক্‌তে পারে—তা স্বাধীনভাবে বিচার করা চলে। পুরুষে পুরুষে যে সখ্য, পুরুষ ও নারীতে সেরূপ সখ্য থাকা কি অহিতকর না অসম্ভব ?"

"এইরূপ সখ্যের একটা বাধা আছে। পুরুষদের মধ্যে দেহঘটিত কোন প্রশ্নই উঠ্‌তে পারে না, স্ত্রীলোক-পুরুষের মধ্যে সেই সখ্য থাক্‌লে দৈহিক প্রভেদের দরুণ নানারূপ কুফল হ'তে পারে।"

"ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখের হেতুভূত দেহের উপর কল্পিত এবং অতিরঞ্জিত একটা পবিত্রতা আরোপ কর্‌লে তাতে ক'রে কতকগুলি সংস্কারের উৎপত্তি হয়—যাতে মানুষের দুঃখ বাড়ে বই কমে না। বিলাতে মধ্যযুগে সে সংস্কার কতকটা ছিল, এখনও যে নাই, তা বল্‌ছি না, তবে আমাদের তা' এতটা বেশী—যে তুলনাই চলে না। এই সংস্কারের জন্য স্ত্রীলোক-গুলিকে পোকামাকড়ের মত পর্য্যন্ত চিতার আগুনে জ্বালিয়ে মারা হয়েছে। এখনকার দিনে এই সংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়া আর চলে না।"

"দৈহিক নিষ্ঠা ও যৌন সম্বন্ধে একব্রত, পরায়ণতা—ইহার আদর সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে থাক্‌বে। বিবাহ-পদ্ধতি এই আদর্শটাকে খুব বড় করে দেখাচ্ছে। ইহা জনসমাজের স্থায়ী সম্পদ—সনাতন নীতি। দৈহিক পবিত্রতার উপর জোর না দিলে সমাজে এরূপ জটিল প্রশ্নের উদয় হবে, যাতে করে এই সমাজ আর টিক্‌তে পারবে না।"

"বৌদ্ধ জাতকে দেখা যায় বিবাহের নিয়ম এককালে অত্যন্ত শিথিল ছিল, তার পর উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতু এসে বিবাহের ভিত্তিটা শক্ত

করে গড়লেন, এখন সেই ভিতটা ধ্বসে পড়ছে। আর এক জন শ্বেতকেতুর আসার দরকার হয়েছে, যিনি এই দৈহিক পবিত্রতার কল্পনাটা থাট ক'রে নরনারীর অবাধ-মিলনের সুযোগ দেবেন এবং নানাবিধ কৃত্রিমতা ও অত্যাচার হ'তে স্ত্রীলোকদের রক্ষা করবার সুযোগ দিয়ে তাদের মনুষ্যত্বের আদর্শে গড়্‌বেন।"

"এদেশে তা কখনই হবার নয়, বাল্মীকি বীণা বাজিয়ে লব কুশকে যে গান শিখিয়েছিলেন; ভবভূতি যে গানের অতি উচ্চ তান যোজনা করেছেন, কালিদাস শকুন্তলার ছবি এঁকে যে গীতি মনোহারী করেছেন,—সেই একনিষ্ঠ প্রেম—দেহের কলুষ শূন্য আত্মোৎসর্গ—এদেশ হ'তে যাবে না। বিবাহ পদ্ধতি উঠিয়ে দাও, কিন্তু নরনারীর ভিতর যদি দেহের ব্যবধানটা ধর্ম্ম বলে রক্ষা না করা হয়, তবে তোমরা দেশরক্ষার অক্ষয় কবচ হারিয়ে ফেল্‌বে। যদি এ জাতিকে টিকে থাকতে হয়—তবে শত শত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও নিবৃত্তি ধর্ম্মটা জলপ্লাবনের সময় ব্রহ্মডাঙ্গার ন্যায় উঁচু করে রাখতে হবে, তা না হ'লে এদেশ হ'তে বাৎসল্য ও দাম্পত্য উঠে যাবে। এ দুটি জিনিষকে ভারতবর্ষ খুব বড় করে দেখেছে। রামায়ণ যে গার্হস্থ্যটার ভিত্তি স্থাপন করেছে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম সেটাকে ধর্ম্ম ক'রে গড়ে ফেলেছে। শুধু বাঙ্গালায় নয়—সমস্ত ভারতের মর্ম্ম-কথা হচ্ছে নিবৃত্তি। দৈহিক নিষ্ঠাকে অগ্রাহ্য করে এদেশের সমাজ গ'ড়ে তুলবার কল্পনা মিথ্যা।"

"এই সকল ভাব প্রবণতার কথা, sentiment, এর ভিতর যুক্তি তর্ক নাই, বাবা, আমি আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হ'তে পারি না। আমি স্ত্রীলোকের দেহটাকে একটা দেবমন্দির কল্পনা ক'রে সেটাকে চন্দন দিয়ে ঢেকে রাখা একটা বাতুলতা মনে করি।"

"তা' তোমার খুসী বাবা, কিন্তু আমার একটা কথা শুনবে, আমি কোন কালেই তোমার স্বাধীন মতে বাধা দেই নি। সামাজিক প্রশ্নগুলি

বড় জটিল, সংস্কারকের পথ কন্টকাকীর্ণ, তাহা পুষ্পশয্যা নয়। (রাজীবের হাত ধরে) বাবা তুমি সাধুচরিত্র, অতি মৃদু ও লাজুক আমার বউমাটিকে এই সামাজিক সংস্কারের জালে টেনে এনে, তার প্রাণে ক্লেশ দিওনা।"

"দেখুন, আমি যাকে বিয়ে করেছি, তাকে আমার মনের মতন ক'রে গড়ে তুল্‌তে হবে। তা' না হ'লে আমার জীবনটা যে মাটী হয়ে যাবে। আপনার কথা রাখার অর্থ আমি জীবনে যে সংস্কার-ব্রত গ্রহণ করেছি সেটার মূল উচ্ছেদ করা, অর্থাৎ আমাকে চিরকালের জন্য গৃহসুখ হ'তে বঞ্চিত করা। আমি একটা অবোধ কাঁদুনী মেয়ের বৃথা লজ্জা ও সংস্কারের প্রশ্রয় দিয়ে তার সঙ্গে ঘর-কন্না কর্‌তে পারব না। তাহ'লে সেই রামচন্দ্রের যুগে আমাকে যেতে হ'বে ; তার পর যে চারটি হাজার বছর চলে গেছে এবং সমাজ ভিন্ন ভাবে গ'ড়ে উঠেছে, তার কোন খোঁজ খবর না নিয়ে একটা প্রাচীন যাদুঘরের মত আমার বাড়ীটাকে পূর্ব্বতন সামাজিক অবস্থার একটা সমাধি-ক্ষেত্র ক'রে রাখতে পারব না।"

"তুমি বড় হয়েছ, এখন ত বিষয় আসয় দেখ্‌ছ। বউমার অশান্তি ও উদ্বেগ আমি কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পারব না। তোমার মাতৃ-বিয়োগের পর থেকে আমি বৃন্দাবনে যাব বলে অনেকবার সঙ্কল্প ক'রেও বউমার মায়ায় যেতে পাচ্ছি না। শতদল স্বামীর বাড়ীতে একভাবে গৃহস্থালী কচ্ছে। আমি যে অবস্থা দেখ্‌ছি তাতে আমার ভাল ঠেক্‌ছে না। সুরেশ ও নরেশ কলিকাতায় বোর্ডিংএ থেকে পড়্‌ছে। তাদের জন্য আমার ভাবনা নেই। আমি কালই বৃন্দাবন যাব। বউমার অশান্তি আমি কিছুতেই সহ্য করতে পার্‌ব না। তার পরে তোমার স্ত্রী, তুমি মনের মতন করে গ'ড়ে নিও।"

"তা বৃন্দাবন যেতে চান, যাওয়া মন্দ কি ? আমি জানি আমার কাজ আপনার ভাল লাগ্‌বে না।" কিন্তু একটা কিছু নূতন ক'রে গড়ে তুল্‌তে গেলে

তার মধ্যে কিছু বেদনা থাক্‌বেই। বহুদিনের ঘা সারতে হ'লে অস্ত্রোপচার চাই। আপনার এখানে থাকাটা বরঞ্চ অস্ত্র হিসাবেও ভাল দেখ্‌ছি না। যেহেতু লবঙ্গকে যা' করতে বল্‌ব, অমনই আপনার প্রশ্রয় পেয়ে তার ফোঁস্‌-ফোঁসানি বেড়ে যাবে। তার আর কোন জোর নেই, এটি নিশ্চিতভাবে জান্‌তে পারলে সে সম্পূর্ণভাবে আমার হাতে আত্ম সমর্পণ কর্‌তে পারে ও আমার ইচ্ছামত তার চলা সহজ হ'তে পারে।"

১১

বুড়োর যা' কথা, তাই কাজ। তার পরদিন তিনটার ট্রেণে তিনি তল্পীতল্পা বেঁধে বৃন্দাবনের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। যাবার আগে দুই ঘণ্টা তিনি লবঙ্গের সঙ্গে নির্জ্জনে কি কথাবার্ত্তা বলেছিলেন, এবং স্নেহময়ের সঙ্গে একটা নিরালা ঘরে বসে কতকটা সময় আলাপ করেছিলেন। রাজীব ভাব্‌ল, ভালই হ'ল। চারটি বন্ধু আছেন, তার উপর স্নেহময় এসে জুটেছেন। বেশ ভালমানুষ গো বেচারী, সংস্কারের ধার ধারে না, কোন গোলযোগের মধ্যে নাই, শুধু হাসিটুকু মুখে লেগেই আছে। এখন হ'তে রাজীব চৌধুরীই বাড়ীর পুরোপুরী মালিক। "সদর-অন্দরের আর এখন দুটো পথ রাখ্‌ব না, মেয়েগুলিকে পোষা পাখী করে পিঁজরায় বদ্ধ করে রাখার রীতিটার ইতি দিতে হবে।" এইরূপ শুভ সঙ্কল্পগুলি লয়ে রাজীব সংসার-রণাঙ্গনে দস্তুর মত অবতীর্ণ হ'লেন।

লবঙ্গকে ডেকে এনে বল্লেন, "এখন তো তোমার আর খোঁটার জোর নেই। এস, দাস তোমার সঙ্গে খানিকটা নিরালা আলাপ করতে চান, তাতে তোমার সম্মত হ'তেই হ'বে। তা না হৈলে তিনি ভাবেবন কি বল দেখি। তিনি আমার অতিথি বন্ধু, তার প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখান

কি আমার উচিত নয় ? তুমি তো হিন্দুর ঘরের মেয়ে, আতিথ্য জিনিষটা তো বোঝ !"

লবঙ্গ। "নিরালা কথা বলবার দরকারটা কি বল-দেখি ? আমি তো তোমার আদেশ পালন ক'রে এঁদের পাঁচজনের সঙ্গেই কথাবার্ত্তা কইছি।"

"তিনি যদি তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে একটু সুখ পান, কোন্ যুক্তি বলে তুমি তা' হ'তে তাঁকে বঞ্চিত করবে ? সব্বায়ের সাম্‌নে তো মন খুলে কথা বলা চলে না, যদি তাঁর প্রাণের ভিতর তোমার সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তার স্বাধীনতা লয়ে আমোদ প্রমোদ করবার ইচ্ছা থাকে, তাতে তোমার আসবে যাবে কি ? তুমি তো যে তুমি তাই থাক্‌বে। মাঝের থেকে অতিথি বন্ধুকে একটু আদর ও সম্মান দেখান হবে।"

"গোপনে আমোদ প্রমোদ অর্থ কি ? তুমি কি ইচ্ছা কচ্ছ, যে তোমার স্ত্রী ব'লে আমার একটা মর্য্যাদা নাই, আমাকে যার তার সঙ্গে গোপনে আমোদ প্রমোদ ক'রে সুখী করতে হবে, আমি যে তোমার স্ত্রী, সে কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ ?"

"না গো ভুলি নাই। আর ভুলব কেমন করে ? এই যে তুমি জলজীবন্ত আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছ। তবে তুমি এটি জানবে যে আমার ছোঁয়াচে ব্যারামটি নেই। তোমার সঙ্গে কেউ কথা বল্লে এমন কি রহস্য করে যদি চিবুকে হাত দেয়, কিম্বা গাত্র স্পর্শ করে, তবে আমি মাথা খুঁড়ে মর্‌ব না। বন্ধুকে সুখী কর্‌তে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত। আমি তোমার সংকীর্ণমনা সেকেলে স্বামী নই। আমার অন্তঃকরণ আকাশের মত উদার।"

লবঙ্গ। তুমি সব সইতে পারবে ?

রাজীব। সব্ মানে কি ? ক্ষণস্থায়ী সুখ-দুঃখের হেতুভূত এই যে জড় দেহ, তার উপর আমি কোনই জোর দেই না। তুমি যদি অপরের দিকে চেয়ে একটু হাস, কি কাউকে আদরের সঙ্গে স্পর্শ কর, ইহা ক্রীড়া-কৌতুক

ভিন্ন কিছুই নয়। ইহাতে যদি বন্ধুর সুখ হয়, আমার তাতে হানি কি হবে বল দেখি? তোমারই বা তাতে যাবে আসবে কি? এ নিয়ে এত মিথ্যা বকাবকি কচ্ছ কেন?"

"দেখ, আমি তোমার বন্ধু ঐ দাসের সঙ্গে নিরালা ঘরে বস্‌ব না। লোকটি সুবিধার নয়।"

"সে কি? ওযে এবার বি, এ অনার্সে প্রথম হয়েছে। ওকে তুমি জাননা! বারনার্ডস, মেটারলিঙ্গ প্রভৃতি জগৎ বিখ্যাত ঔপন্যাসিকদের বোদ্ধা ওঁর মত আর দ্বিতীয়টি নাই। আর্ট বস্তুটা উনি যা বুঝেছেন, এরূপ খুবই কম লোকে বুঝেছে। উনি বলেন, "সমাজনীতি পরিবর্ত্তনশীল, তা' কেবল পায় বেড়ী দিতে জানে, তা সংকীর্ণতার দিকে মানুষের মনকে টেনে নিয়ে যায়, আর্ট হচ্ছে নিত্য, চিরসুন্দর, চিরকুমার, আকাশের ন্যায় উদার, বায়ুর ন্যায় স্বাধীন!" তুমি একবার ওঁর সঙ্গে নিরালা মিশা-মিশি ক'রে দে'খ, শেষে বুঝবে ওর বন্ধুত্বের দর এবং তোমাকে এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ দিয়ে উনি তোমার কতটা ভাগ্যবতী করেছেন। কলকাতায় বহু বন্ধুর স্ত্রী ওঁর গুণের পক্ষপাতী। এমন কি যোগেন চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী তাঁর স্বামীর সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে দুইমাস কাল দার্জ্জিলিঙ্গে ওর সঙ্গে কাটিয়ে এসে-ছিলেন, সংকীর্ণচেতা চক্রবর্ত্তী তাই নিয়ে একটা বৃথা হট্টগোল ক'রে লোকের উপহাসাস্পদ হয়েছিল।"

"আমি কিছুতেই ওঁর কাছে যাব না। তুমি যখন এতটা পীড়াবাড়ি কচ্ছ, তখন লজ্জার মাথা খেয়ে আমাকে সব কথা বলতে হ'ল। সেদিন টেবিলের উপর আমি বসে একখানি চিঠি লিখ্‌ছিলুম, উনি এসে "আমায় কলমটি একবার দিন দেখি, এক মিনিট পরে ফিরিয়ে দিচ্ছি" এই ব'লে আমার হাত থেকে কলমটা কেড়ে নিলেন, এবং সেই সময় আমার হাতে এমন একটা চাপ দিয়ে গেলেন, যাতে করে সারাদিন রাগে আমার গা

গিস্ গিস্ কচ্ছিল। রবিবার দিনটা আমি খেতে বসেছি, ঐ বড় ঘরটার জানলার খরখরি দিয়ে এমনই কুচক্ষে আমার দিকে চেয়েছিলেন,—আমরা স্ত্রীলোক, পুরুষের ভাব বেশ বুঝতে পারি,—সেই দৃষ্টির থেকে নিজকে বাঁচবার জন্য আমি আধভাত থালায় রেখে হাত ধুয়ে এলুম। আমি বারাণ্ডায় থাকি, কি কৌচের উপর বসে থাকি,—মিছামিছি কোন দরকার নেই,—উনি উঠে এসে এখান থেকে ওখানে যাওয়ার ছলে আমার গা ঘেঁষে চলে যান্। তোমায় সত্য বল্‌ছি, তাতে আমার গায়ে যেন একটা আগুনের হাল্‌কা চলে যায়। স্নেহবাবুর কথা ছেড়েদি, তার মত ভাল লোকে জগতে দুর্ল্লভ, আর যারা তিনজন আছেন তারাও বখাটের রাজা; ইয়ার্কি দিতে ও চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে অভদ্রোচিত ইঙ্গিত দিতে তারাও বেশ পটু, সেই চুরুটের ধোঁয়ায় তো আমার মাথা ধরাটা লেগেই আছে, কিন্তু তোমার দাস হচ্ছেন লম্পটের শিরোমণি। আমার মেরে ফেল, কেটে ফেল, আমি ওঁর সঙ্গে নিরালা এক ঘরে সেকেণ্ডের জন্যও থাকব না।”

“তুমি দেখছি একবারে ঠিক্ একটা পাড়াগেঁয়ে জানোয়ার, ইংরেজী তো শিখেছ—তবু তোমার এই সকল কুসংস্কার গেল না? যদি কেউ তোমার মুখখানি গোলাপের মত ঢল ঢল দেখে একবার তার উপর একটু অতৃপ্তির চাউনি বুলিয়ে নেয়, যদি তোমার দেহখানি কোমল দেখে পরশ-লালসায় একটু ঘেঁসে এসে দাঁড়ায়, তা হ’লেই কি ভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল?”

“আমি তো আর ছবি নই, বা একটা মাটীর পুতুল নই। সেই দৃষ্টি ও স্পর্শে যে আমার গায়ে দস্তুর মত আগুনের হাল্‌কা ব’য়ে যায়, লজ্জায় মাটীর নীচে ঢুকতে ইচ্ছা করে। তা তুমি বুঝছ না, অথচ তুমি স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা বলে হৈ, চৈ করে বেড়াও। তুমি আমাকে যা করে গ’ড়ে তুলতে চাও তাতে কি তুমি প্রকৃতই খুসী হ’বে? কখনই হবে না, কারণ আমি জানি ভিতরে ভিতরে তুমি আমায় খুবই ভালবাস।”

"আমি ঠিক বল্‌ছি, আমি যা ইচ্ছা করছি, তুমি তা হ'লে আমি তোমাকে আদরের রাণী ক'রে রাখ্‌ব। তা হ'লে তুমি আমার অনুরোধটি রাখ্‌বে।"

"আজ আমায় দুটি দিন ভাব্‌তে সময় দাও।"

"চার দিন পরে যে কলেজ খুল্‌বে! তিনটি দিনের বেশী ওঁরা আর এবার এখানে থাকতে পারবেন না। তা, ছুটি পেলেই আমি আবার ওদেরে নিয়ে আস্‌ব।"

"এবারটি রেহাই দাও না।"

"না, আমার লক্ষ্মীটি, আজই কবুল হও।"

"একান্তই ছাড়্‌বে না।"

"আমি মাথা খুঁড়ে মরব।"

"আচ্ছা মাথা খুঁড়তে হবে না, কাল হবে।"

১২

পরদিন ৭টার পরে আর লবঙ্গকে খুঁজে পাওয়া গেল না। বাড়ী তন্ন তন্ন করে খোঁজা হ'ল, পুকুরগুলি জাল ফেলে দেখা হল। কোনখানে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে আছে কিনা এজন্য সমস্ত গাছগুলি, ও বাড়ীর ছাদের হুক, দেয়াল, কার্ণিশ খুঁজে—যত রকমের আশঙ্কা মনে হ'তে পারে তার চূড়ান্ত চেষ্টা করে দেখা গেল, কোথাও নেই। কোন পুকুর থেকে মরা ভেসে উঠল না। কোন দেয়ালের গায়, ঘরের মাঝে লাস ঝুলছে এরূপ দেখা গেল না। কোন বিছানায় কাপড় মুড়ি দিয়ে বিষ খেয়ে প'ড়ে আছে কিনা,এজন্য লেপতোষক বারংবার উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখা হ'ল, কোথাও নাই। সকাল আট হ'তে বেলা দুপুর পর্য্যন্ত এইরূপ চেষ্টা শেষ হয়ে গেল। রাজীব চৌধুরীর পাশেই তো রাত্রে শুয়েছিল, তিনি

সাতটার সময় ঘুম ভেঙ্গে তাকে দেখ্‌তে না পেয়ে ভেবেছিলেন, লবঙ্গ ভেতর বাড়ীতে কোথায় কি কাজ করছে। তা'র পর আটটা থেকে খোঁজ করা হচ্ছে। রাজীব চৌধুরীর নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছিল লবঙ্গ আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু তার পরে দেখা গেল সে ধারণা ভুল। লবঙ্গের কাপড় চোপড় ও গহেনার বাক্স নেই, এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানা গেল, স্নেহময় গুপ্তটিও অদৃশ্য হয়েছেন, তাঁর একটা বড় ব্যাগে কাপড় চোপড় ছিল, তাও অন্তর্ধান করেছে। এই ঘটনা সেই বাড়ীর উপর বজ্রাঘাতের মত ঠেক্‌ল। রাজীবের উদার বন্ধুবৎসল, স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিলনের পক্ষপাতী হৃদয়ও এবার বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ল। ষ্টেশনে খবর নিয়ে জানা গেল, রাত্রি ৩টার গাড়ীতে একটি সুপরিচ্ছদ-ভূষিতা অবগুণ্ঠনবতী ভদ্র-মহিলা এবং একটি সুদর্শন তরুণ যুবক দুইটা মুটের মাথায় জিনিষ পত্র দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর দুইখানি টিকিট কেটে কল্‌কাতায় রওনা হয়ে গেছেন। এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান নিয়ে যে বিবরণী পাওয়া গেল তাতে কারু সন্দেহের লেশ রইল না যে গত রাত্রি তিনটার ট্রেনে শ্রীমতী লবঙ্গলতা দেবী ও শ্রীমান স্নেহময় গুপ্ত দুই জনে রঘুপুর ছেড়ে চলে গেছেন। রাজীব চৌধুরী স্নেহময়ের কলিকাতার ঠিকানা জান্‌তেন না, তিনি তাঁর পিতার নিকট বিস্তারিত সমস্ত ঘটনা লিখে এবং স্নেহময়ের ঠিকানা জান্‌তে চেয়ে বড় রকমের একখানি এক্সপ্রেশ টেলিগ্রাম পাঠালেন। একটু দেরীতে উত্তর এল—"যে মেসে স্নেহ থাক্‌ত, খোঁজ নিয়ে জেনেছি সে মেস উঠে গেছে, কলিকাতায় তার বন্ধুবান্ধবেরা কেউ তাঁর সন্ধান জানেনা। সুতরাং তাঁরা কোথায় গেছে, তা' নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। এমনটি যে হবে, তা পূর্ব্বেই জান্‌তুম। তুমি বিষয় আসয় রক্ষা করে কাজ কর্ম্ম কর্‌তে থাক—চিন্তা ক'র না।"

হরি! হরি! এই শ্বশুরের প্রগাঢ় ভালবাসা, এবং স্ত্রীর সতীত্ব!

রাজীব চৌধুরী ভেবেছিলেন, তাঁর পিতা তো বধূমাতা বলতে প্রাণ ছাড়েন—এত বাৎসল্য! একথা শুনে হয় ত বৃন্দাবন থেকে ছুটে আসবেন্। তার জায়গায় এই নিরস শুষ্ক, নিশ্চিন্ত টেলিগ্রাম! আর লবঙ্গলতা, একদিন বলেছিলে "স্নেহময়ের মত ভাল লোক জগতে দুর্লভ!" হায়! কোন দিক দিয়ে হাওয়া বইছিল, তা আমি মোটেই টের পাই নি। দাসের সম্বন্ধে এতটা সতীত্বের মুখোস প'রে—নর্ত্তকীর ন্যায় অভিনয় ক'রে আমাকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে অবশেষে এই কল্লে! সেই পুরাতন, জীর্ণ, সভ্যতার স্রোতে আবর্জ্জনার মত গা ভাসিয়ে দিয়ে নূতন ভাবে জীবন গড়তে রাজীব চেষ্টিত ছিলেন, সেই পুরাতন ঝুড়ির কীটদষ্ট তালপাতার শ্লোকই তার বারংবার মনে পড়তে লাগল—"স্ত্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং। দেবাঃ ন জানন্তি কুতঃ মানবাঃ।"

যখন চৌধুরী পরিবারে এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল—তার বছর খানিক পরে শতদল তাঁর পুত্র ও কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে রঘুপুরে তাঁর পিত্রালয়ে এসে পৌঁছিলেন। পিতা যে বৃন্দাবনবাসী হয়েছেন, এটুকু তিনি জেনেছিলেন। কিন্তু ছোট ভাই রাজীবের বউটি যে পালিয়ে গেছে, তার কোন খবরই তিনি রাখ্তেন না।

বাপের বাড়ীতে এসে তিনি দেখ্লেন, মস্ত বড় পুরীটা যেন খা' খা' কর্ছে। ছোট দুই ভাই নরেশ ও সুরেশ ছুটি পেলেই বাড়ীতে আস্ত, বাপের জন্য তাদের মন যত না কাঁদত, কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর বউদির জন্য তাঁদের প্রাণের টান খুব বেশী ছিল, বউদিই তাদের মায়ের জায়গাটা নিয়েছিলেন। তিনি চলে গেছেন, শুনে তাদের মনের আগ্রহ সবটা জুড়িয়ে গেল। দাদা রাজীব চৌধুরী তাদের যথারীতি খরচ পাঠিয়ে চুপ ক'রে থাকতেন, বাড়ীতে যাবার জন্য কোন দিনই চিঠি দিতেন না। লবঙ্গ পালাবার পর থেকে তার মনটা স্ত্রী-বিদ্বেষী হ'য়ে উঠল। অবস্থা ভাল,

বিদ্বান, বুদ্ধিমান, একটু সাহেবীয়ানা থাকলেই বা, তাতে কি আসে যায়? কত লোক যে মেয়ে নিয়ে তাকে বিয়ের জন্য সাধাসাধি করতে লাগল,—আর অবধি নেই। তিনি বাড়ীর নায়েবকে ডেকে এনে ব'লে দিলেন, "কোন লোক, তিনি যদি আমার ইষ্টগুরুও হন, যদি এখানে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন, তবে তাঁকে বিদায় ক'রে দেবেন। তার পরও যদি তাগাদা করেন, তবে দুর্ল্লভ তেওয়ারীকে দিয়ে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেবেন।"

নায়েব মহাশয় চৌধুরী-সাহেবের মেজাজটি জান্‌তেন। এর পর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে কেউ আর সেই বাড়ীর ত্রিসীমা মাড়ায় নাই।

রাজীব অনেক সময়ই চুপ ক'রে বসে থাকতেন। বাড়ী ছেড়ে আর আগে যেমন মাঝে মাঝে কলকাতা ছুটতেন, সে অভ্যাস ছেড়ে দিলেন। কারু সঙ্গে মিশ্‌তেন না, বন্ধুদের সঙ্গে চিঠি পত্র লেখা পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। 'চা'এর পেয়ালা ধ'রে, হাত উঁচু করে হয়ত আধ ঘণ্টাটেক ব'সে আছেন, এর মধ্যে চা জুড়িয়ে হিম হয়ে গেছে, খেয়াল নাই। বসে বসে কি ভাবতেন, কাউকে জান্‌তে দিতেন না, তবে তার ভাবনার অনেকটা জায়গা জুড়ে যে লবঙ্গতার কথা ছিল, তা কারু বুঝতে বাকি থাকৃত না।

বরঞ্চ খুব জেদের সঙ্গে জমীদারীর কাজ মন লাগিয়ে দেখ্‌তেন, শুনতেন। নরেশ ও সুরেশের জন্য মাসিক ১২৫৲ ও লতাকে ২০০৲, মোটামুটি এই দুইটি খরচ মাসিক বহাল রেখে আর সমস্ত ব্যয় সংক্ষেপ করতে লাগ্‌লেন। "কামিনী ও কাঞ্চন" নিয়ে সাধুরা অনেক উপদেশ দিয়ে থাকেন। "কামিনী" চলে গেছেন, এখন আছে কাঞ্চন। রাজীব চৌধুরী জমিদারীর আয় বাড়াতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। এই আয় বৃদ্ধির চেষ্টায় ন্যায় অন্যায় বোধ তাঁর কিছুমাত্র ছিল না; পরের দুঃখকে তিনি

কোন কালেই গণ্য কর্‌তেন না, ছোটকালেও টাকা পয়সার ব্যাপারে তার বিষম লোভ ছিল। শেষকালটায় রাজীবের এই অর্থলোভের দরুণ ও পিতার সঙ্গে তার মনান্তর ঘটেছিল। রজনী চৌধুরী ছিলেন শিব-চরিত্র, সংসার সমুদ্রের অনেক হলাহল তিনি আকণ্ঠ পান করেছিলেন। শিব ঠাকুরের কণ্ঠে একটা দাগ ছিল—রজনী চৌধুরীর তাও থাকৃত না। তাঁর স্ত্রী মৃত্যুকালে তাঁর সমস্ত গহনা-পত্র কন্যা শতদলকে দিতে অনুরোধ করে যান। তার দাম ছিল প্রায় ১০,০০০ টাকা। একখানি বড় হীরে ও দুই খানি পান্না খুব দামী ছিল। মাতার মৃত্যুর প'রে পিতাকে জিজ্ঞাসা না করে রাজীব চৌধুরী সেই গয়না গুলি দিয়ে দুর্গা-প্রতিমার মাথায় পরার ৩০০, ভরির এক প্রকাণ্ড মুকুট তৈরী করেন। তারই মধ্যে সেই হীরা ও পান্না বসান হয়। রজনী চৌধুরী যখন এই ব্যাপারটা জান্‌লেন, তখন পিতা পুত্রের মধ্যে যে আলাপ হ'ল, তাতে একদিকে যেমনই পিতার মৃতা পত্নীর দানের অপলাপে মনোভঙ্গ বোঝা গেল, অপর দিকে পুত্রের কুটিলতা ও স্বার্থপরতা তেমনই ধরা পড়্‌ল। রাজীব কখনও দুর্গামণ্ডপের ধারে কাছে যেতেন না, হঠাৎ তাঁর ভক্তির প্রাবল্য এতটা হল যে দুর্গা-প্রতিমার জন্য এত বড় মুকুটটা গ'ড়ে ফেল্লেন। রজনী চৌধুরী বুঝলেন, কন্যাকে ঠকাবার জন্য পুত্রটি বেশ পাকা চাল চেলেছেন। ঠাকুরের মাথার মুকুট—এ সম্বন্ধে হিন্দু ঘরের রমণী কিছু মুখ ফুটে বল্‌তে পারবে না। সুতরাং মাতার দানের কথা শুনেও তাকে ঠাকুর দেবতার ভয়ে চুপ ক'রে থাক্‌তে হবে। ছেলে মেয়ে নিয়ে তো সবাই ঘর করে, ঠাকুরের মাথায় মুকুটের উপর দাবী ছেঁদে কে আর ছেলেমেয়ের অকল্যাণ করতে ভরসা পাবে? শতদল অবশ্য তখনও এ সকল ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও শোনেন নাই। তাঁর পিতা ভাবলেন, এ সকল কথা নিয়ে পুত্রের সঙ্গে ঝগড়া করা মিথ্যা। সে তেমন পাত্রই

নয়, ভাঙ্গবে তবু মচ্‌কাবে না। সুতরাং তিনি মনে করলেন যে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে মেয়েকে হাজার দশেক টাকা দিয়ে গেলেই সে ঠাণ্ডা হবে—আর গোলযোগ করে লাভ কি? অবশ্য যদিও তিনি গোঁড়া ভক্ত ছিলেন, তথাপি সেই মুকুট খানি দেখ্‌লেই তাঁর চোখে জল আস্‌ত। তাঁর স্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করে যে সকল গয়না তাঁর চক্ষে মহামূল্য ছিল—সেই মুকুট খানি সেই অমূল্য সম্পদের সমাধির মত মনে হয়ে তাঁর বুকে কাঁটার মত বিঁধত। কন্যাকে তা দিলেও তাঁর জীবিত অবস্থায় সেগুলি সে না ভাঙ্গে—এই অনুরোধ তিনি কর্‌তেন।

পত্নীর পলায়নের পর থেকে রাজীবের নির্ম্মম চরিত্র আরও নির্ম্মম হয়ে উঠ্‌ল। প্রজাদের সর্ব্বস্বান্ত ক'রে বাকী খাজনার দায়ে তাদের বসতবাটী নিলাম কর্‌তে তার কোন দ্বিধা বোধ হইত না। একদিন একটি মুসলমান প্রজা এসে তাঁকে বল্লে "হুজুর আপনি মিথ্যা মোকর্দ্দমা ক'রে আমাকে দেড় বছরের জেলে পুর্‌লেন; আমি অপর কারু কাছে নালিস কর্‌ব না, মোকর্দ্দমাটি যে নিতান্ত মিথ্যা, তা আল্লা যেমন জানেন, আপনিও তেমনই জানেন, এখন আমার নালিশ আপনারই কাছে। এখন দেখুন, আমার কি দশা হয়েছে। এই দেড় বৎসর জেলে ছিলুম,—এর মধ্যে আমার পাঁচ বছরের ছেলেটি জ্বর বিকারে মারা গেছে, আমার স্ত্রীকে ফুস্‌লিয়ে আর একটা লোক কোথায় নিয়ে গেছে, তার ঠিকানা নেই। দুখানি দোচালা ঘর ছিল, তা পড়ে গেছে, তিন বিঘা জোত-জমি ছিল, তা গাঁয়ের পঞ্চায়েত ঘুষ খেয়ে অপর একটা লোককে বিলি করে দিয়েছে। এখন দেখ্‌ছেন, আপনার মিথ্যা মোকর্দ্দমার ফলে আমার কি সর্ব্বনাশটা হয়েছে?—এখন যাব কোথায়? দাঁড়াব কোথায়? আবার জেলে পাঠিয়ে দিন। আমার গতি এখন আল্লা ও হজুর।" এই বলে সে দুহাতে চোখের জল মুছে থামাতে পারলে না। রাজীব চৌধুরী হেসে বল্লেন—"ওরে ও রকম বিপদ

অনেকেরই হয়, মিথ্যা বল্লেও হয়, সত্য বল্লেও হয়। আমি তোর গতি নই, আল্লার কাছে গিয়ে বল্, আমি তো আর তোর আল্লার চাইতে বড় নই। তোর উপর এই জুলুম কর্‌তে আল্লা আমায় শক্তি দিলে কেন? আমি কি আর তার মর্জ্জি না হ'লে এই জুলুম কর্‌তে পেরেছি। তোর সেই শুধু ভিটেটার উপর চিলের মত উপুড় হয়ে পড়ে আল্লাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্, তোর উপর এই জুলুম কর্‌বার শক্তি আমায় দিলে কেন? লোক যাকে আল্লা বলে, আমি তাকে সয়তান বলি। এটা আল্লার রাজ্জি নয়, সয়তানের রাজ্জি।" এই বলে চোখের জলে যে ব্যক্তি পথ দেখ্‌তে পাচ্ছিল না, তাকে দারোয়ান দিয়ে তিনি বাড়ীর বা'র করে দিলেন, এবং হাস্‌তে হাস্‌তে দেওয়ানের দিকে তাকিয়ে বল্লেন "এত বড় সূর্য্যটাকে দিয়ে জগৎকে পুড়িয়ে মার্‌ছেন, তাঁর ক্ষমতা তো দেখছি অসীম। আপনারা যাকে ন্যায় বা ধর্ম্মের পথ বলেন, তিনি যদি সেই ধর্ম্মের মালিক হতেন, তা হ'লে আমাকে তিনি মশাটার মত এক থাপড়ে মেরে ফেল্‌তে পার্‌তেন। তা, যথন কচ্ছেন না, তখন বুঝ্‌বেন ধর্ম্ম টর্ম্ম আপনাদের মন-গড়া। এই মুসলমানটাকে তো আমি নিতান্ত মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে জেলে পুরেছিলাম, অবশ্য তার পর যা ঘটেছিল তার উপর আমার কোন হাত ছিল না। কিন্তু যদি কেউ 'দয়াময়' থাক্‌তেন, তবে তাঁর তো দয়া হ'ত। আর তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হ'লে এ সব হ'তে পার্‌ত না। ন্যায় অন্যায় কিছু নেই। যার বল সেই আইন করবে, এবং তারই ইচ্ছা জগন্নাথের রথের চাকার ন্যায় নিরীহদের বুকের ওপর দিয়ে অস্থি-পঞ্জর ভেঙ্গে চলে যাবে—এই হচ্ছে সনাতন নিয়ম। আপনারা এই নিয়ম মেনে নিয়ে আমার ষ্টেটের আয় [illegible]বেন—এতে দ্বিধা বোধ কর্‌বেন না।" নায়েব মশায় 'হাঁ' 'না' কিছু না ব'লে চুপ করে মাথা হেঁট ক'রে ব'সে রইলেন।

ষ্টেটের কর্ত্তা ছোট ভাইটির যথন মনের অবস্থা এইরূপ, সেই

সময় শতদল এসে উপস্থিত হ'লেন। পাড়ার সব্বাই এসে বউএর পালাবার বৃত্তান্তটা তাঁর কাণে তুল্‌তে দেরি কল্লে না। রাজীব এসে দিদিকে প্রণাম করে বাইরে চলে গেলেন। দিদির মুখে যোগেশের চাকুরী ছাড়ার কথা শুনে তিনি মনে মনে আতঙ্কিত হলেন, এবার বুঝি সমস্ত পরিবারটা তাঁরই ঘাড়ে চাপে। তিনি নানারকম প্রতারণা করে ষ্টেটের আয় বাড়াচ্ছিলেন, তাঁর দিদির সে সকল পন্থা অনুমোদিত হ'তে নাও পারে। এদিকে ছোট দুটি ভাইকে হাত ক'রে তিনি তাঁদের বিদ্রোহী করে তুলতে পারেন, এ আশঙ্কাও ছিল; সুতরাং সব দিক দিয়েই শতদলের সে বাড়ীতে থাকা তার খুব বাঞ্ছনীয় মনে হ'ল না। কিন্তু সে সকল মনের কথা চাপা রেখে তিনি দিদিকে প্রণাম ক'রে চলে গেলেন, এবং দিনের মধ্যে কখনও দুই একবার দেখা হ'লে বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা না ব'লে চলে যেতেন। শতদলের ইচ্ছা ছিল, ছোট ভাইয়ের কাছে বিনিয়ে বিনিয়ে যোগেশের নির্ব্বুদ্ধিতার কথা ব'লে তার সহানুভূতি প্রগাঢ়ভাবে আকর্ষণ করেন, কিন্তু কথা বলবার সুবিধা মোটেই রাজীব তাঁকে দিতেন না।

শতদল ভাবলেন, বধূর পলায়নের জন্য ভাই বিরাগী হয়ে গেছে, পাছে সেই সকল কথা তুলে তিনি তাকে মনে ব্যথা দেন এই ভয়ে সে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকে—এরূপ অবস্থায় তার লোকসঙ্গ ত্যাগের ইচ্ছা ও নির্জ্জনতার অভিলাষ কতকটা স্বাভাবিক—এইজন্য ভ্রাতার দুঃখে আন্তরিক দুঃখিত হয়েও তিনিও তার কাছে বেশী ঘেঁষ্‌তেন না; ভাবতেন, কয়েকটা দিন যাক্, তার পর ধীরে ধীরে রাজীবের মনের দুঃখ এই যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে তা' দুর হবে, তখন অবকাশ মত পরস্পরের মধ্যে আলাপ চল্‌তে পারবে।"

সেই বৃহৎ পুরীর যে দিকে তাকান, তাতেই তাঁর চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত

হয়। যে ঘরে শিশুকালে তাঁকে তাঁর মা শাড়ী পরিয়ে দিতেন, বারেন্দায় যে আল্‌সেটার উপর হাত রেখে তিনি এক রেকাবী সন্দেশ এনে তাঁর জল খাওয়ার জন্য পীড়াপিড়ি কর্‌তেন, যে ঘরে দাসীদের চুল বাঁধা মনঃপুত না হ'লে তিনি নিজ হাতে রূপোর চিরুণী দিয়ে তাঁর চুল আঁচড়ে হাত দিয়ে টিপে টিপে খোপা বেঁধে দিতেন, সেই সকল স্থান প'ড়ে আছে, তা দেখে তার প্রাণটা কেবলই হাহাকার ক'রে উঠত। আর মনকে শতবার চোখ ঠেরে বারণ করলেও সে উধাও হয়ে বেলেঘাটের যে জায়গায় বসে তার হতচ্ছাড়া স্বামী কলা মূলো বিক্রি কচ্ছেন, সেই দিকে চলে যেত। এত রাগ, যার পর্ব্বত-প্রমাণ বোঝার চাপে তাঁর স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতাটা তিনি পিষে ফেল্‌তে পারতেন, সেই রাগ, দুর্জ্জয় অভিমানও নিজ বুদ্ধির উপর অখণ্ড বিশ্বাস সত্বেও—সে সমস্ত ঠেলে ফেলে স্বামীর কথা মনে পড়্‌তে চোখের জল উথ্‌লে উঠ্‌ত। তার অবাধ্য মনটা তিনি ন্যায়শাস্ত্রের বলে কিছুতে নিজের বশে আন্‌তে পার্‌তেন না; কেবলই মনে হ'ত, আজ হয়ত মূলো বেচে একটা পয়সা পেয়ে ছোলা ভাজা খেয়ে তিনি টিনের মগ হ'তে ঢোকে ঢোকে জল খেয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুইই নিবৃত্তি কচ্ছেন—তখন তার দুর্জ্জয় মানকে দূর ক'রে দুর্জ্জয় চোখের জল গণ্ডস্থল প্লাবিত করে ফেল্‌ত।

এই ভাবে প্রায় দেড়মাস গত হওয়ার পর সেয়ালদহ মুসলমান পাড়ার ছাপ নিয়ে তাঁর স্বামীর হাতের একখানি চিঠি এল।

চিঠিটি এইরূপ,

"আমার শতদলপদ্ম,

এই দেড় মাস যাবৎ যা' খাটছি, তা যদি দেখ্‌তে তবে তুমি নিশ্চয়ই কষ্ট বোধ কর্‌তে। দিনের মধ্যে কতবার যে বৈষ্ণ-বাটী, খিদিরপুর, বাড়ুইপুর, রাজার বাজার, বাসদেবপুর প্রভৃতি গ্রামে আনা গোনা কর'তে
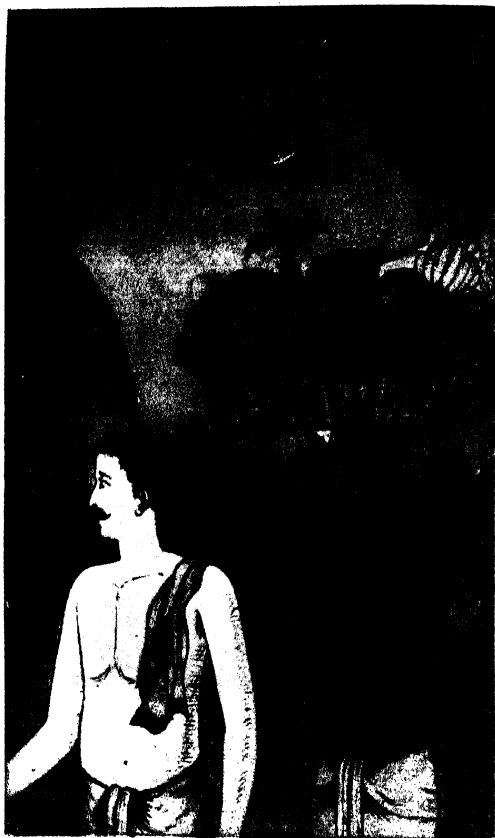
"ঝাঁকায় ক'রে কলা, মানকচু, আনারস মুটের মাথায় দিয়ে চালান দিচ্ছে"—৬৩ পৃঃ

হচ্ছে, তার ঠিকানা নাই। ঝাঁকায় করে কলা, মানকচু, আনারশ, প্রভৃতি মুটের মাথায় দিয়ে রেলে এনে চালান দিচ্ছি। কখনও কখন ছুই এক মণের বোঝা পর্য্যন্ত মাথায় করে আধ মাইল টেক পথ বয়ে নিতে হচ্ছে। কি ক'রব, মজুর না পাওয়া গেল তো জিনিষ লোকসান দিতে পারি নি। তুমি বলেছিলে দুমণের বোঝা ঘাড়ে ক'রে কি তুমি কুলিগিরি করতে পারবে? দুমণ না হউক, এক মণ তো পা'রছি। "শরীরের নাম মহাশয়, যা' স'ওয়াবে তা'ই সয়" অভ্যাসে সকলই হয়। এই যে দেহটা বিলাস-রসে পুষ্ট হয়ে একটা অকর্ম্মণ্য কচুর ডগার মত ফেঁপে উঠেছিল, পরিশ্রমের দরুণ তা' কঞ্চীর মত দৃঢ় হচ্ছে। বিলাস সবই ত্যাগ করেছি, গামছা দিয়ে মুখ মুছি; রৌদ্রে দিনরাত ঘুরতে হয়—ছাতার পিছনে বেশী পয়সা খরচ না ক'রে ভিজে গামছা খানি মাথায় দিয়ে পথে হাটি।

"তার পর তোমায় হিসাব দিচ্ছি। সেই যে সেভিং ব্যাঙ্ক হ'তে দেড় হাজার টাকা তুলে নিয়েছিলুম—তার মধ্যে, মুদি, গয়লা, কাপড়-ওয়ালা প্রভৃতির দেনা শোধ করতে ১০১৭৶০ খরচ হয়ে গেল। খাট, পালঙ্ক, চেয়ার, টেবিল, আলনা ও কতকগুলি তৈজসপত্র বিক্রয় ক'রে পাওয়া গিয়াছিল ৭৫২॥০ টাকা, মোট হাতে ছিল ১২৩৫৶০, তার মধ্যে বাড়ীওয়ালার তিন মাসের ভাড়া শোধ ২৭০৲ টাকা, চাকর বাকরের মাহিয়ানা ১০৭৲ টাকা এবং হাওলাত শোধ বাদে ছিল ৭৯৫৶০। তোমাদের যাওয়ার খরচ ও কিছু পুজি দিয়েছিলুম ৪০০৲ টাকা এবং ৩৫৮৶০ আনা নিজে রেখেছিলুম। এই দেড় মাসে ঐ টাকা অল্প অল্প ক'রে খাটিয়ে ৫৪০৸১০ করেছি। সুতরাং এই দেড় মাসে আমার আয় হয়েছে ১৮২৷৵০। আমি নিজে একটা ছোট হোটেলে খাটিয়া পেতে শুয়ে থাকি, তাদের ওখানে খাওয়ার বাবদ দিতে হয় প্রতি বেলা ৵১০ এবং থাকার দরুণ বাড়ী-ভাড়া দিতে হয় মাস ১৷০। আমার ছুই বেলা খাওয়ার

সময় হয়ে উঠেনা, যেহেতু মহাজনদের দেনা-পাওনা শোধ ক'রে সমস্ত হিসেব মিটিয়ে আস্‌তে আমার অনেক রাত্রি হয়ে পড়ে, তখন ভাত গুলি একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে ও পিঁপড়ে বেছে খেতে হয়। এজন্য বিকেল বেলাটা প্রায়ই দুই এক পয়সার মুড়ি খেয়ে থাকি। মুড়িটা খেতে বেশ, বিপিনের পছন্দের আমি তারিপ না ক'রে থাকৃতে পাচ্ছি না।

"এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছি, এই যে কষ্টের জীবন—ইহাই প্রকৃত জীবন, ইহাই জীবন-সংগ্রাম, ইহাতে যে জয়ী হয় সেই রণ-জয়ী। সাহেবেরা এইরূপ সংগ্রাম ক'রে জয়ী হয়েছেন। এই যে দিন রাত খাট্‌ছি—এ যেন মহোৎসব। সারাদিন খাটার পর যে ঘুম হয় তা কি নিশ্চিন্ত! সে নিদ্রা যে কি সুনিদ্রা, তা' তোমাকে কি ক'রে বুঝোব? ছারপোকা ও মশার কামড়েও ভাঙ্গে না। যার এরূপ ঘুম, তার আর মশারির দরকার কি? আধ পেটে যে ক্ষুধা কিরূপ বেড়ে গেছে, তা' যদি দেখ্‌তে, হোটেলওয়ালা আমার থেকে ৶১০ নিয়ে লাভ করা দূরে থাকুক,—বোধ হয়, তার দস্তুর মত লোকসান্ দিতে হচ্ছে। নিজের কাজ পরকে দিয়ে কারবার মধ্যে যে হীনতা ও নির্ভর আছে—তা এখন বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি। নিজে খাব, তার জন্য একজনের পীড়া পেতে দিতে হবে, একজনকে হাওয়া করে ভাত জুড়িয়ে দিতে হবে, একজনকে ঘটি গামছা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকৃতে হবে, আমায় যে তোমরা মাটির পুতুল করে রেখেছিলে। এখন এসে দেখ, কলের থেকে এক মগ জল নিজে এনে আমি কি তৃপ্তির সঙ্গে স্নান কচ্ছি! নিজে বাজার থেকে মুড়ি কিনে কোচড় ভ'রে কি দিব্বি সুখে চিবোচ্ছি। তোমার হাতের দেওয়া রেকাবের লুচি-সন্দেশের আমি অমর্য্যাদা কচ্ছি না, কিন্তু এই মুড়ি পেট ভরে খেয়ে আমি যে আনন্দ পাচ্ছি—তেমন আনন্দ আমি খুব কম নিমন্ত্রণ খেয়েই পেয়েছি। সকলের চাইতে বড় কথা—আমি অধীনতা, লজ্জা, দৈন্য—ও নিত্যকার অপমানের যে জালে পড়ে-

ছিলুম—তা থেকে মুক্তি লাভ করেছি। আমার নিজের মধ্যে যে শক্তি আছে, এ হচ্ছে সেই শক্তি আবিষ্কারের আনন্দ। আমি যে কারু অধীন নই, এ হচ্ছে সেই স্বাধীনতা লাভের আনন্দ। ইহা আত্ম-মর্য্যাদা ফিরে পাবার আনন্দ। তারা লুটে পুটে খাবে, এবং আমাদিগকে পদ-দলিত করে দুই একটা উচ্ছিষ্ট ছুঁড়ে ফেলে পিঠ চাপড়াবে—এই কুকুর-বৃত্তি হতে রক্ষা পেয়েছি। জনসন্‌কে উপলক্ষ করে ভগবান আমাকে স্বাধীনতার মন্ত্র শিখিয়েছেন—আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছি।

"আমার নিজের জন্য ৬৷৭৲ টাকার বেশী খরচ করি না। বাকী সমস্তই কারবারে খাটাচ্ছি। তোমাকে আজ ৩০৲টি টাকা পাঠালুম। এ টাকা তোমার স্বামীর গায়ের রক্ত জল করে উপার্জ্জিত হয়েছে, এ. কেরাণীগিরির টাকা নয়। তোমার পিত্রালয়ে অবশ্য বিশেষ কোন খরচের দরকার নাই, —যে টাকা যখন পাঠাতে পার্‌ব, তা' যদি সঞ্চয় করতে পার, তবে ভাল। বিপিনের সম্বন্ধে কি করব, তা' ভাব্‌ছি। মারবেল দেওয়া মেহেগনীর টেবিলটা যখন বিক্রী করি, তখন তুমি বড্ড কেঁদেছিলে। শতদল, এখনও তুমি সেই খুকিটিই আছ—তারা মাটির পুতুল ভাঙ্গলে কাঁদে। তুমি যাবার পূর্ব্বে তিনটি দিন রাগ ক'রে আমার সঙ্গে কথা বলনি। এই নির্ম্মমতা মনে ক'রে তোমার কষ্ট হয় না? আমার তো তোমাদের কথা মনে পড়্‌লে চোখে জল আসে। কিন্তু যেরূপ দিনরাত খাট্‌ছি, তাতে তোমাদের পর্য্যন্ত ভাব্‌বার অবসর আমার কোথায়?

"সুন্দরীকে একটু লেখাপড়া, ঘরের কাজ ও শেলাই শিখিও, এসব বিষয়ে তো তুমিই ওস্তাদ। রজনীগন্ধার রক্তিম গোল গাল দুটোতে অনেকদিন চুমো খাই নি। সে চুমো খেয়ে হেসে আমার গলা জড়িয়ে ধর্‌ত, সেই স্পর্শ আমার মনে পড়লে বোধ হয় যেন আমার গলার বহুমূল্য

একটা হার ছিঁড়ে পড়েছে। রাজীবকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ দিবে আমার জন্য দুর্ভাবনা ভেব না, দুঃখ কো'র না,—আমি খুব সুখে আছি। একথার এক বর্ণও মিথ্যা নয়, জানবে।

তোমার চির-শুভার্থী

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়"

পত্র পাবার ২।৪ ঘণ্টা পরে ত্রিশটি টাকার মাণিঅর্ডার এল। শতদল সেই মনি-অর্ডারের পেছনে "রিফিউজড্" লিখে তা' ফেরৎ পাঠালেন। তিনি কয়েটি ছত্রে স্বামীর পত্রের জবাব দিলেন ; তাহা এই—

"তুমি মুটে মজুর সেজে বাহাদুরী করছ,—স্ত্রী পুত্রকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে হোটেলে খাচ্ছ। আমার দেওয়া লুচি সন্দেশের থেকে এক পয়সার মুড়ির বেশী ক'রে তারিপ কচ্ছ। এ সকল কথা আমায় শুনিও না। তুমি নিশ্চয় জে'ন—বক্তৃতা ক'রে তুমি আমার মনের দুঃখ নিবারণ করতে পারবে না। তোমার এত কষ্টের পয়সা—যা তুমি জলে ঝাঁপ দিয়ে, আগুনে পুড়ে রোজগার কচ্ছ, তোমার এত দামের পয়সাগুলি তুমি নিজে রেখ—এবং তা দিয়ে কচুশাক ও আমলা কিনে হাটে বিক্রী কো'র। তুমি ঐ ত্রিশটা টাকা, যার গলা ফাটিয়ে প্রশংসা করছ, এবং তাও আমাকে পুঁটুলি ক'রে রেখে দিতে বলছ, তা তুমি নিজেই রেখ, ও যকের ধনের পাছে সাপ হাটবে, ও আমি চাই না।

আর তুমি আমায় চিঠি পত্র লিখে জ্বালিও না। এরূপ চিঠির কথা অপরে শুনলে আমার মাথাটা কতটা ছোট হ'বে তা তুমি যদি বুঝতে, তবে এ সকল কথা লিখতে পারতে না। তুমি দেড়মণ বোঝা মাথায় নিয়ে মুটে সেজেছ—একথা প্রচার হ'লে তোমার স্ত্রীপুত্রের মর্য্যাদাটা যে কোথায় থাকবে—এও কি তোমার একবারটি মনে হ'ল না? এইরূপ চিঠি যদি

বিপিন দেখে, তবে তার মাথাটা বিগড়ে যেতে পারে। দোহাই তোমার, তুমি আমায় চিঠিপত্র লিখ না।

শ্রীশতদলবাসিনী দেবী

এদিকে কলেজ খুলেছে। বিপিনকে ভর্ত্তি না করলেই নয়—তাকে কলকাতায় মাতুলদের সঙ্গে বোর্ডিংএ রাখতে হবে। এ সম্বন্ধে রাজীবের সঙ্গে আলাপ করতে শতদল উৎসুক হয়ে পড়লেন। স্বামীর প্রেরিত ত্রিশটি টাকা ফেরৎ পাঠিয়ে তিনি সোয়াস্তি বোধ করেন নাই। "রিফিউজড্" লিখ্‌বার সময় কে যেন মনের ভেতর থেকে ডেকে বল্‌ছিল, "শতদল, ভাল কর্‌ছ না, কার অদৃশ্য হাতের বাধা যেন তিনি মনে মনে বুঝেছিলেন, তা'তে লিখ্‌তে গিয়ে হাত বাধ বাধ হয়েছিল। এমনই করে [illegible] অন্যায়ের বাধা দেন—অতি মৃদু ভাবে। অনেকেই তা না শুনে, নিজের ইচ্ছাটাকে প্রবল করে দেখে। শতদলও সে বাধা মানে নাই। তার দুর্জ্জয় অভিমানটি মনের ভিতর বড় হয়েছিল। সে রাত্রটা স্বামীর জন্য তার প্রাণটা কেবলই ধড়ফড় ক'রে উঠেছে—চিঠিখানি লিখে ডাকে দেওয়ার পর থেকে কে যেন বুকের মধ্যে অবিরত হাতুড়ির ঘা মারছিল। সারা রাত্রি তাঁর ঘুম হয় নি।

রাজীব চৌধুরী সেই টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা নায়েবের কাছ থেকে শুনেছিলেন,—তাঁর এই সকল কাণ্ড মোটেই ভাল লাগ্‌ছিল না। বিপিনকে যে কলেজে ভর্ত্তি ক'রে দিতে হ'বে, এটা তিনি বিপদ বলেই মনে করেছিলেন। তা' হলে তো কায়েমী ব্যবস্থাই হ'ল! এর পরে শতদলই বাড়ীর কর্ত্তা হয়ে ভাই দুইটিকে ফুস্‌লিয়ে পর করে দেবেন, এবং তাঁর সমস্ত কাজের বাধা দেবেন। এই শনি-গ্রহের দৃষ্টি ভাল নয়। প্রথম থেকে যদি বাধা না দেওয়া যায়, তবে প্রশ্রয় দ্বারা বল ক্ষুদ্র বুদ্ধিগুলি ভাল ক'রে অনর্থ ঘটাবেন।

পরদিন শতদল প্রাতে রাজীবের ঘরে নিজে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন, তখন সবে ঘুম থেকে উঠে রাজীব চা' খাচ্ছিলেন।

দিদিকে দেখে তিনি বলে উঠ্‌লেন, "ভাল আছ তো দিদি? বল তো কা'ল তুমি যোগেশবাবুর দেওয়া টাকা ফিরিয়ে দিলে কেন? তুমি তো চিরকাল এখানে থাকতে আসনি। স্বামী ছেড়ে কেউ তো এমন ক'রে থাকে না। আর বিপিন কল্‌কাতা না গিয়ে যদি দৌলতপুর কলেজে পড়ে, তবে খুব কম খরচায় হয়,—তা হ'লে যোগেশবাবু যদি মাস মাস ত্রিশটা ক'রে টাকা দেন, তবে তাতেই এক রকম কুলিয়ে যেতে পারে। তা না হ'লে যদি বিপিন কল্‌কাতা যেতে চায়, তবে সেখানে গিয়ে বাপের সঙ্গে থাক্‌তে পারে। সেখানে বাপ তাকে তাঁর ইচ্ছা মত গ'ড়ে তুল্‌বেন। তুমি টাকাটা ফিরিয়ে পাঠাতে লিখে দাও।"

শতদল যা' বল্‌বেন, তার সমস্ত কথারই উত্তর পেয়ে গেলেন। তবু শেষ কথা না শুনালে ত নয়। তাঁর গলা বাধ বাধ হয়ে এসেছিল, তবু যেন জোর করে বল্লেন, "উনি তো মুটে-মজুর সেজে রোজগারের চেষ্টা পাচ্ছেন, বিপিন তার কাছে গেলে তাই হবে, আমি কিছুতেই তাকে ওঁর কাছে যেতে দিব না। আর যিনি ইচ্ছা করে সাহেবদের চটিয়ে ওমন সোনার চাকুরিটি খুইয়েছেন, এবং এক পয়সার মুড়ি কিনে খেয়ে ব্যাপারীদের সঙ্গে গিয়ে চাষা সেজেছেন, তার দেওয়া টাকা আমি চাই না। আমার কি তোদের বাড়ীর উপর কোন দাবী দাওয়াই নাই? মেয়ে হ'য়ে জন্মেছি বলে কি দরকার হ'লে তোরা আমাকে খেতে দিবি না, কিম্বা আমার ছেলেদের লেখাপড়া শেখবার ব্যবস্থা করবি না?"

রাজীব। "দিদি, সে বড় শক্ত সমস্যা। আমার স্ত্রী তাঁর বাপের বাড়ীর থাক্‌বে—এও কি ভাগ হয়ত পেতেন, কারণ তাঁর ভাইটি নিরুদ্দেশ হয়ে [illegible]দের চ'লে গেছে। এখন আমার আর দুই ভাই

আছে তাদের বে'থা' দিতে হ'বে। বার মাসে তের পার্ব্বণ আছে, তা ছাড়া আজকালকার জমিদারদের সরকার বাহাদুর যা' ক'রে রেখেছেন, প্রজারা কথায় কথায় নালিস করে। তার পর নন-কোপারেশনের হুজুগ। দল বেঁধে বিদ্রোহী হয়ে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে। এ সময় তোমরা খামখেয়ালী করে ঝগড়া ক'রে আমাদের বোঝা বাড়াবে এটা কি ঠিক?"

শতদল। "তা হ'লে বুঝ্‌লুম, বিপিনের পড়ার ভার তুমি নিতে রাজী নও।"

রাজীব। "একরূপ তাই বই কি? তুমি যোগেশ বাবুকে লিখে ওকে দৌলতপুর কলেজে ভর্ত্তি ক'রে দাও। সে কলেজও তো মন্দ নয়, এখান থেকে বেশী দূর নয়, সেখানে সতীশ মিত্রের মত প্রফেসার আছেন, আর ব্রজবাবু কলেজের উন্নতির জন্য প্রাণপণ কচ্ছেন।"

শতদলের চোখের কোণে অশ্রু উঠেছিল, তা' থামিয়ে তিনি ক্ষণকাল বিলম্ব না ক'রে সেখান থেকে হন্ হন্ করে চলে গেলেন।

নিজের ঘরে এসে মাথায় হাত দিয়ে তিনি ভাব্‌ছেন। রজনীগন্ধা তাঁর বেণীটা ধরে টান্‌ছে, তিনি ঠাস্ ক'রে তার গালে একটা চড় মার্‌লেন। সুন্দরী দেখ্‌লে তার মায়ের মুখে রাগের রক্তিমা। রজনীগন্ধাকে কোলে ক'রে সে অন্যত্র চ'লে গেল। এমন সময় বাড়ীর বুড় বামুনদি এসে সেই ঘরে চৌকির একটি কোণে বসে বল্লেন "শতদল, তোমায় আজ এমন দেখ্‌ছি কেন? কোন খারাপ সংবাদ এসেছে কি?" শতদল তাঁর কোলে-কাখে মানুষ হয়েছিল, সুতরাং বুড়ী তাকে খুব ভালবাস্‌ত। সে বল্লে "কৈ? কোন খারাপ সংবাদ নেই, বামুনদি, বিপিন কোথায় গেছে?"

বামুনদি। "ঐ যে কর্ত্তাবাবুর যত হাতের লেখা পুরাণা পুঁথি আছে, তার মধ্যে উই লেগে গেছে,—সেইগুলি ঝেড়ে পুথিগুলি ভাল ক'রে

রাখ্‌ছে। তার মধ্য হ'তে কয়েকখানি ছবির পাটা নিয়ে তাই দেখ্‌ছে। পূজা তো এসে পড়্‌ল,—দুর্গাঠাক্‌রুণের মুকুট তুমি দেখ নি?"

শতদল। "মুকুট কিসের? ডাকের সাজ?"

বামুনদি। "না গো, তোমার মায়ের সমস্ত অলঙ্কার দিয়ে মুকুট গড়া হ'য়েছে, তা' দেখনি! তিনশ ভরির সোনার মুকুট, তাতে কত চুনি পান্না হীরে। ঝাড়ের আলোতে সে মুকুট যেন সূর্য্যের মত জ্বল্‌তে থাকে। দুর্গোৎসবের সময় দেখ্‌তে পাবে?"

শতদল। "সে মুকুট গড়ালে কে?"

বামুনদি। "কেন? বড় বাবু গড়িয়েছেন।"

শতদল। "তার আবার এতটা ভক্তি হ'ল কবে?"

বামুনদি। "কর্ত্তার ইচ্ছা ছিল না। ওঃ মা; তুমি কি জাননা! মাঠাকুরুণ যে তোমাকেই সে সকল গয়না দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু বড় বাবু তা' ভেঙ্গে তাড়াতাড়ি করে মুকুট গড়িয়ে ফেল্লেন। কর্ত্তা আগে কিছুই জানতেন না, শেষে ঐ মুকুট দেখে বড় বাবুর সঙ্গে অনেক তর্কবিতর্ক কল্লেন, তাঁর অত্যন্ত অনিচ্ছা বোঝা গেল। যা' হো'ক সে মুকুট তো হ'য়ে গেছে।"

শতদল আর কিছুমাত্র বিলম্ব না ক'রে একটা ঝড়ের মত রাজীব-চৌধুরীর ঘরে ঢুকে পড়লেন। তাঁর উগ্রমূর্ত্তি দেখে রাজীববাবু হাঁ ক'রে বল্লেন, "কি হয়েছে?"

শতদল। "আমার মায়ের অলঙ্কার তিনি আমায় দিয়ে গেছিলেন, তা' দিয়ে তুই দুর্‌গো ঠাকুরুণের মুকুট গড়িয়েছিস্।"

রাজীব। "তা তো বাবা জানেন। তোমার আমার কাছে সেই গয়নাগুলি থাকাই ভাল না চিরকালের জন্য মন্দিরে দেবতার মাথায় মুকুট হ'য়ে থাকাই ভাল? তুমি আমি হয়ত সেগুলি নষ্ট করতে পারতুম, বিক্রী

রাজীব বাবু হাঁ করে বল্লেন, “কি হয়েছে ?”—৭০ পৃঃ

ক'রে ফেলতুম। কিন্তু এ যে স্থায়ী হয়ে পবিত্রভাবে চিরকাল রক্ষিত হবে, এতে কি দোষ হয়েছে?"

শতদল। "কি ভক্ত! সেই মুকুটের দাম যা হয়, তা' আমাকে দে!"

রাজীব। "মুকুট তো আমার ব্যবহারে লাগাইনি দিদি, যে তুমি তার দাম আমার কাছে চাইতে পার!"

শতদল। "তোর এ ফাঁকির দান, ঐ পরকে ঠকাবার কৌশলটা ভক্তির দান ব'লে কখনই দেবী গ্রহণ করবেন্ না।"

রাজীব। "তুমি যে যা' তা' বল্‌ছ। স্বামীর কুল হারিয়ে এখানে গলগ্রহ হয়ে থাকবে, এবং যার খাবে তার গলা টিপে ধর্‌বে।"

এই কথার পর শতদল কিছুকাল কোন উত্তর দিলেন না। মুক্ত কেশ-পাশে তাকে দুর্গো প্রতিমার মতই দেখাতে লাগলে,—এ যেন মহিষাসুর বধ করার জন্যই দাঁড়িয়েছেন। তার স্ফুরিত নাসারন্ধ্রে ও চোখ মুখ দিয়ে যেন জ্বালা বেরোতে লাগল। তিনি বল্লেন—"এই ঠকের বাড়ী ত্যাগ করলুম, আর এই ঘৃণিত কুকুরের বাড়ীর ত্রিসীমা মাড়াব না। দেখি, ভক্তির তুই কি পুরস্কার পাস্,—একটা বড় রকমের পুরস্কার তো পেয়েছিস্, যাতে করে জ্বলে পুড়ে মর্‌ছিস্।"

এই ব'লে তিনি সেই দিনই পুত্রকন্যাদেরে নিয়ে পিতৃ-গৃহ ত্যাগ কর্‌লেন।

১৩

তেনাইগ্রামে এসে দেখেন, তাঁদের তিন বিঘার উপর যে বাড়ীখানি ছিল, তার একটা ভিটার উপর একটা শালের খুটি সমাধি স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে। আর একখানি ঘর যেন এখুনি শুয়ে পড়্‌বে, এমনই ভাবে কা'ত হয়ে আছে। আর ভিটেগুলির উপর অনেক গুল্মলতা

জমেছে, তার মধ্যে চড়ুই পাখী লাফালাফি কচ্ছে। গরুর গাড়ীর থেকে মাল-পত্র নামিয়ে শতদল নিজ বাড়ীতে শীর্ণ পদ্মের উপর লক্ষ্মীঠাকরুণের মত এসে যখন দাঁড়ালেন, তখন ছোট গ্রামখানি ভেঙ্গে সব লোক তাঁদের দেখ্‌তে এল। তিনি দেখ্‌লেন, যদিও তিনি জীবনে তার স্বামীর পৈত্রিক ভিটায় একবার মাত্র বহু বৎসর পূর্ব্বে এসেছিলেন, তথাপি গ্রামবাসীরা যেন তাঁর কত আত্মীয়। বাপের বাড়ীর হাওয়া যেন তাঁকে পুড়িয়ে মার্‌ছিল, কিন্তু তেনাইগ্রামের সুপরি-নারিকেল আম কাঁটালের হাওয়ায় যেন তিনি জুড়িয়ে গেলেন। তারা যেন তাঁর কত কালের চেনা।

তাঁর হাতে চারশ টাকা ছিল তার মধ্যে প্রায় ষাট টাকা বাপের বাড়ীতে যাওয়ায় খরচ হয়ে গেছিল। এখানে আসতে গরুর গাড়ী ও মুটে বাবদ ২৸৶ আনা লাগল। অবশিষ্ট তিনশ টাকার কিছু উপরে তার হাতে সম্বল ছিল। তিনি ভাঙ্গা ঘরখানি মেরামত ক'রে আর একখানি ঘর উঠোলেন। বাড়ীটা পরিষ্কার করে চারিদিকে বেড়া দিলেন এবং তিন টাকা বেতনে কেষ্টা বাগদীকে বাইরের চাকর নিযুক্ত কর্‌লেন। সমস্ত কাজ, ঘর নিকানো হতে রান্নাবান্না এবং থালাবাটী মাজা প্রভৃতি, নিজে কর্‌তে লাগলেন, সুন্দরী ও বিপিন তার সমস্ত কাজে সহায় হ'ল।

তবুও তার ভাল লাগ্‌তে লাগল। লোকে ব'লত, "এত বড় সোয়ামি, এত বড় বাপের বেটী—কিন্তু মুখে কথাটি নেই; যেন বাড়ীর দাসী—রাজীব চৌধুরী কি পাষণ্ড! এমন বোনকে তাড়িয়ে দিয়েছে, মায়ের দেওয়া গয়নাগুলি কেড়ে নিয়ে শূন্য হাতে এমন লক্ষ্মীমাকে বনবাস দিয়েছে।"

যার ভিতরে প্রেম আছে, তার কি অভিমান বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারে? স্বামী যে কি কষ্টে কাজ ছেড়েছেন, অল্পে অল্পে শতদল তা' বুঝ্‌তে পারলেন। তিনি আগুনে ঝাঁপ্ দিলেও তো এমন ভাইএর ভাত খেতে পার্‌তেন না, সাহেবদের দৌরাত্ম্য স'য়ে তিনিই বা কিরূপে কাজে

থাক্‌তে পারতেন? নিজে দুঃখে প'ড়ে তিনি স্বামীর দুঃখ কতকটা বুঝ্‌তে পার্‌লেন। কিন্তু তখনও মান একবারে টলে নাই। তাঁকে এমন রূঢ় ভাষায় পত্র লিখে আবার কি ক'রে তাঁর এই হীন অবস্থা জানবেন? বাপের বাড়ী থেকে যে এতটা অপমান পেয়েছেন, তা যে স্বামীকেও জানাতে বাধবাধ ঠেক্‌ল। এ লজ্জা গিলে খাওয়ার, বল্‌বার নয়।

কিন্তু দিনের পর দিন যাচ্ছে, হাতের টাকা তো ফুরিয়ে এল। এখন চল্‌বে কিসে? তার গায়ের যে-সকল গয়না ছিল, সেক্‌রা ডেকে সেগুলি বিক্রয়ের চেষ্টা পেলেন। সেক্‌রা এসে বল্ল "মা, এ সকল গয়নায় যে সোনা নেই, কেবলই পালিসের কাজ, পাড়াগাঁয়ের লোক এ সকল জিনিষের দর বুঝ্‌বে না; পাইনে ভরা যে সোনাটুকু আছে তার কি আর ন্যায্য দর পাবেন?"

শতদল, সুন্দরীকে দিয়ে বলে পাঠালেন, "যে দর হয়, তা যত সামান্যই হউক না কেন, তাই দিয়ে তুমি কিনে নাও।" সুন্দরীর মাথার একখানি চিরুণী যোগেশবাবুর এক বন্ধু দিয়েছিলেন, তা' এবং তার হাতের বাঘমুখো তাড়ের বালাজোড়া খাটি সোনার ছিল। সমস্ত গয়না বিক্রয় করে তিনি ৩০৫৲ টাকা পেলেন, এই গয়নাগুলির পেছনে যোগেশ বাবুর অন্ততঃ তিনটি হাজার টাকা প'ড়েছিল। সবই ক্যারেট গোল্ড, তাতে তো ভরি পিছু ৫।৭৲ টাকার বেশী পাওয়া গেল না, অথচ মজুরী সমেত তার এক একখানির দাম, ২০০।২৫০৲ টাকা পড়েছিল। হ্যামিল্টনের দর সহরে যাই থাকুক, পাড়াগাঁয়ে এইরূপ শোচনীয়।

একদিন শতদল দেখ্‌লেন, বিপিন কয়েকখানি ছবির পাটা দেখে কি আঁকছে। তাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন "এ পাটা তুই কোত্থেকে পেলি?"—

বিপিন। "বড় মামা দিয়েছেন।"

শতদল ঠোঁঠ বেঁকিয়া বিরক্তি প্রকাশ কর্লেন। বিপিন উৎসাহের সহিত বল্লে—"সেই যে দাদাম'শায়ের পুরণো বইগুলি ছিল, তার মধ্যে এক খানি চৈতন্যচরিতামৃত ছিল—প্রায় ২৫০ বছরের প্রাচীন, তাতে শক লিখা ছিল ১৬০১। ইংরেজী সনের সঙ্গে শকের ৭৮ বৎসরের তফাৎ—তা প্রায় ২৫০ বছরের পুরাতন লেখা—কি সুন্দর হাতের লেখা, দে'খ," এই বলে সে মাকে বইখানি দেখালে।

"এই বই তুই আন্‌লি কি ক'রে।"

"শোন, বলে যাচ্ছি। দেখছ কেমন্ ঝক্‌ঝকে মুক্তোর মত অক্ষর। আরও কতকগুলি পুঁথি এনেছি, তার মধ্যে ভাল ভাল বৈষ্ণব পুস্তক আছে। আর এই সকল কাঠের ছবি কি সুন্দর! দেখ দেখ কেমন চৈতন্য নাচ্‌ছেন! ওঁর নৃত্য দেখলে, ওঁর কথা মনে হ'লে আমার সর্ব্ব অঙ্গ নৃত্য ক'রে ওঠে।"

"এগুলি কি ক'রে আনলি তা' বল্লি না?"

"বল্‌ছি শোন। একদিন ঠাকুর ঘরের পাশের ঘর থেকে এই পুঁথি গুলি ঝাড়্‌ছি। বড় মামা এমনই অযত্নে সেগুলি রেখে দিয়েছিলেন, পোকায় কতক কতক কেটে প্রায় সাবাড় করবার্ জোগাড় করেছিল। আচ্ছা মা! বড় মামা তো বিদ্যার জাহাজ, তিনি লেখাপড়ার জিনিষের এমন অমান্য করেন কেন? শুনলুম, দাদাম'শয়ের বৃন্দাবনে যাওয়ার পর থেকে ভাল আলমারীটা থেকে এগুলি সরিয়ে এনে একটা কেরাসিনের কাঠের বাক্সের মধো রেখেছিলেন, তদবধি এগুলিকে পোকায় কাটতে সুরু করে দিল। আমি এগুলি ঝেড়ে পরিষ্কার কচ্ছি. দেখে বড় মামা বল্লেন, "হাঁরে বিপ্‌নে, এই জঞ্জালগুলি ফেলে দে। ঐ পুকুরটার জলে ফেলে দিয়ে আয়। যা কুইএ ধরেছে—কুই ক্রমশঃ ক্রমশঃ ঐ ঘরটায় ঢুকে আমার দামী কাপড় চোপড় কেটে ফেল্‌বে।" আমি বল্লুম—"মামা, এগুলি ফেলে দেবেন? এগুলি আমায় দিন্ না।"

"তোকে দেব ? তুই রাখ্‌বি কোথায় ?—আবার রুই এসে জড় হবে, কত ঝাড়বি ? পুরোণো বাঁশের কলমের গন্ধ পেয়েছে, রুইগুলি কি ছাড়্‌বে ?"

আমি। "বড় মামা, আপনি এত লেখাপড়া শিখেছেন, এগুলি যে শাস্ত্র—এর মর্ম্ম আপনারা বুঝবেন না ?"

মামা। "ইংরেজী লেখাপড়া শিখ্‌লে, সে দেশের সরস্বতী বলে দেন, এগুলিকে ঝেঁটিয়ে ফেলে দিতে। তবে তো ইংরেজী শিক্ষার ফল এ দেশে ফল্‌বে, তা না হ'লে ওদের মধ্যে যে কুসংস্কারের কাঁটা গাছ আছে, তা বিলাতী দামী গাছের চারাটাকে এমনই ঘিরে রাখবে, যাতে ক'রে কোন কালেই তার ফল ফল্‌বে না।"

এই কথা শুনে যে আমার কি কষ্ট হ'ল তা বলতে পারি না। আমি তাঁকে বিনয় করে বল্লুম, "মামাবাবু, আমায় এগুলি দিয়ে দিন—ফেলে দেবেন না। আপনার বাড়ীতে এদের দরুণ একটি রুইও আস্‌বে না। আমি সকালে বিকালে ঝেড়ে পুঁছে রোদে দিয়ে এগুলি ঠিক রাখব।"

মামাবাবু হেসে বল্লেন, "নে—যা, এগুলি প'ড়ে মাংগোসাক্রি-গিরি করিস্‌।"

তদবধি এগুলি খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেম, আস্‌বার সময় নিয়ে এসেছি।"

"আচ্ছা মা, তুমি বৃন্দাবনে দাদাম'শায়কে পত্র লিখে দাও না!"

"তাঁকে আমাদের গোলযোগে টেনে এনে কি হবে! তিনি এ সকল কথা শুন্‌লে অত্যন্ত মর্ম্মপীড়া পাবেন, অথচ আমার অনুকূলে কিছু কর্‌তে গেলে রাজু তার সঙ্গে এমনই ঝগড়া লাগিয়ে দেবে যে, তাঁর বৃন্দাবনে তেষ্ঠান দায় হ'য়ে উঠ্‌বে। শেষ বয়সে তাঁকে এ সকল গোলযোগে টেনে কষ্ট দেব না। আমরা যেমন অদৃষ্ট ক'রে এসেছি, তেমনই সব ঘট্‌ছে।

বাবার গতিকে আমি থেমে আছি, নইলে আমার মায়ের গয়নার দাবী ক'রে আদালতে নালিশ রুজু ক'রে দিতুম। বাবা একটা বিভ্রাটে পড়্বেন—এজন্য কিছু কচ্ছি না। কিন্তু রাজুর কাণ্ডটা তুষের মত আমার মনে জ্বলছে, সহজে যে ছাড়্ব তা মনে হয় না। কেবল বাবার কথা মনে হ'লে আমার সমস্ত তেজ নিবে যায়।"

আর দুই এক মাস পরে, আবার টাকা প্রায় ফুরিয়া আস্বার উপক্রম হল। শতদলের হাত খরচের দিকে, একদিন হয়ত খুব হাত কষে খরচ করেন,—বাজারে পাঠান না, শুধু ভাতে ভাত খেতে হয়। রজনীগন্ধা এখন বেশ কথা বলতে শিখেছে। সে বলে "মা ঐ সখীদের বাড়ী গেছলুম—তারা বড় লোক, তাদের কেমন খাট, কত রঙ্গের তোষক, বালিস,—আমি সেই তোষকে বসেঁছিলুম। সখির মা আমায় সন্দেশ খেতে দিল, সন্দেশ কি সুন্দর খেতে! মা তুমি আমায় সন্দেশ কিনে দেবে। মাচায় শুতে ভাল লাগে না, খাটে শুতে ভাল লাগে।"

আর এক দিন রজনীগন্ধা কাঁদতে কাঁদতে এসে বল্লে, "সখী আমায় তাদের বাড়ী নে গেছল, আমি তাদের খাটে গিয়ে বসেছিলুম—আমায় তার ভাই বিভূতিটা এসে গালে চড় মেরে নাবিয়ে দিয়ে বল্লে, "মাচায় শোন, উনি আবার কাদা পায়ে খাটে উঠেছেন!" আমাকে হাত ধরে টেনে বার করে দিয়েছে—রাজুটা বড় দুষ্ট।"

শতদল রজনীগন্ধার মুখ আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে বল্লেন "ওদের বাড়ী গেছ্লি কেন? ওদের খাটে কি মা পাওয়া যায় রে বোকা? এই মাচায় তোদের মা থাকে! মা ছাড়া তুই কি খাটে শুতে পারবি, যদি পারিস, তবে বল অনঙ্গদের বড় খাটটায় তোকে রেখে আসি?"

"তুমি যাবে না? চল, তোমার বালিস টালিস নিয়ে, আমরা সেখানে খাটে শোব।"

"ধৎ খুকী, আমি যাব না, তুই যাস্‌তো সুন্দরী তোকে রেখে আস্‌বে।"

"আমি একা শোব না, তুমি যাবে।"

"আমি এই মাচায় শোব, আমার কাছে সুন্দরী শোবে, বিপিন শোবে—তুই একা সেই বাড়ীতে খাটে শুয়ে থাকিস্‌।"

"না আমি যাব না।" ব'লে খুকী মায়ের কোলে গিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে বল্লে, 'আমি তোমার কাছে শোব।' আঙ্গুল দিয়ে মাচার উপরকার বিছানা দেখিয়ে বল্লে "এইখানে তুমি আর আমি শোব,—আর ঐখানে দাদা আর দিদি শোবে।"

শতদল খুকীকে অনেক মানা ক'র্‌লেও আট্‌কে রাখতে পার্‌তেন না। সে ছুটাছুটি করে কখনও অমূল্যদের বাড়ী, কখনও সখীর গলা ধ'রে তাদের বাড়ী, কখনও বা কেষ্টা বাগ্দীর কোলে চেপে কিশোর বাবুর বাড়ীতে যেত, এবং তার সমবয়স্ক বালক বালিকাদের সঙ্গে ছুটোছুটি ক'রে খেলা করত।

এই খেলায় ক্ষুদ্র পরিবারটির মিতব্যয়িতার অনেকটা উলট্‌ পালট্‌ হ'তে লাগল। মেয়ে একদিন এসে ব'লত, "অমূল্যদের বাড়ীতে আজ মস্ত বড় একটা কাত্‌লা মাছ—এনেছিল, তার মা বেশ করে তা ভেজে তার পাতে দিচ্ছিল, মা, আমি আজ কাত্‌লা মাছ ভাজা খাব।" আর একদিন বল্লে, 'মা, আজ সখীও বিভূতি তেনাইর বাজারে গেছিল, কেষ্টা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছ্‌ল, তাদের গায়ের জামায় কত ফুল! কি সুন্দর,—সেগুলি নাকি ছিলখের, পায়ে কি সুন্দর জুতো, তার গোঁপ আছে। আমিও তোমার সেলাই সেমিজটা পরে ছিলুম, তার দুই জায়গায় তালি, অমূল্যটাও সেখানে ছিল, সে আঙ্গুল দিয়ে আমার জামার তালি দেখিয়ে দিল। মা, আমাকে ওদের মত জামা কিনে দিতে হবে, তারা আমায় কত ঠাট্টা করে, তোর শুধু পা, পায়ে কাদা।" আর একদিন বল্লে "মা, কেষ্টা আমায়

মেলা দেখ্‌তে নে গেছল, সাথীর বাপ তাকে কত পয়সা দিয়েছিল, সে কাঠের ঘোড়া কিনেছে—ঠিক সত্যিকার ঘোড়ার মত—তার লেজ ও ক্ষুর আছে! দাদাকে ব'ল না—হ'রে সুতোরের বাড়ীর থেকে আমায় তেম্নি একটা ঘোড়া কিনে দেয়।"

এই সকল আবদারে শতদলের যে কত কষ্ট হ'ত, তা বলা যায় না। বিপিনের চোখ দিয়ে জল পড়্‌ত ও সুন্দরী খুকীকে কোলে ক'রে কাঁদতে কাঁদতে চুমো খেতো। শতদল কোন কোন রাত কেঁদে কাটাতেন, একটি মিনিটের জন্য তাঁর ঘুম হ'ত না। মেয়ের আবদারের জন্য তার হিসাব গোলমাল হয়ে যেত, ব্যয়ের যা বজেট হ'ত, তার দ্বিগুণ খরচ হয়ে যেত।

কিন্তু শতদল এই অসহায় অবস্থায় নিশ্চেষ্ট হয়ে প'ড়ে থাকবার মেয়ে নন। তিনি তার প'ড়ো তিন বিঘে জমি কেষ্টাকে দিয়ে খুব ভাল করে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে নিয়ে, তাতে আনারস, বেগুন, কলা, আলু ও কুমড়ো লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু সেগুলি হতেও তো কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে। এখন অবস্থা একরূপ অচল হয়ে এসেছে।

বিপিন রোজ রোজ ভাবে, আমি এখন বড় হয়েছি, এখানে কোন কাজ কর্ম্মের সুবিধে হবে না, আমি চাকুরী করব না, বাবার নিষেধ—আর আমারও মন সে দিকে যায় না। কিন্তু এই পরিবার তো আমাকেই পালতে হবে। মা-বোন শুকিয়ে মরবে, একি দাঁড়িয়ে থেকে চোখে দেখতে হবে?

এই ভাবনা ভেবে সে একদিন মাকে বল্লে, "মা আমি আর মেয়েটির মত অন্দরে ব'সে থাক্‌লে তো চলবে না, আমাকে ছুটি দাও, আমি কি করতে পারি, তা' একবার ঘুরে দেখে আসি।" শতদল বল্লেন, "তুই কি পড়াশুনা একেবারে বন্ধ করবি? এত সাধের ছেলে—হায়! তোর টাকার জন্য পড়া

বন্ধ হবে—এতো স্বপ্নের অগোচর ছিল। এই বলে তিনি আঁচল দিয়ে চোখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। বিপিন মায়ের চোখের জল মোটেই বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌ত না, সে মায়ের কান্না দেখে অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। শতদল কান্না বন্ধ ক'রে বিপিনের গায় হাত বুলিয়ে বল্লেন, "বাবা একটা কাজ করবি? অনেক ধনশালী লোক কন্যাদায়ে বিব্রত। আমরা কুলীন, এ সকল অঞ্চলে কুলীনের আদর খুবই আছে। বাখরগঞ্জ জেলায় বাসণ্ডার জমিদার বাড়ীর একটি মেয়ে আছে, দেখতে খুবই সুন্দর। বিয়ের প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছে, তোর পড়ার জন্য ভাব্‌তে হবে না, সকল খরচ তারা দেবে, আর নগদ ২।৩ হাজার টাকা দিতে পারে। তাতে আমাদের অনেকটা দুঃখ ঘুচে যাবে।"

বিপিন বসেছিল, উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—"মা আমায় এটি অনুরোধ ক'র না, তুমি জান তোমার কথা আমার কাছে আজ্ঞা, তুমি যা ব'ল্‌বে আমি তাই কর্‌ব। মা আমি শ্বশুরের ব্যয়ে পড়ব না, প'ড়ে কি হবে? তুমি আমার পড়া বন্ধ হ'ল বলে এত ভাবছ কেন? পড়লে যে আমি বড় মামার মত হয়ে দাঁড়াতে পারি! তিনি পড়া শুনোর তো চূড়ান্ত করেছেন। আজ কাল লেখাপড়া শিখেও লোকে রোজগার ক'রতে পারে না, অপদার্থ হয়ে ব'সে থাকে। আমার বাবা তো কলেজে পড়েন নি, তিনি কেমন ইংরেজী শিখেছেন! যেমন সাহেবদের মত চেহারা, তেমনি সাহেবদের মত ইংরেজী বল্‌তে পারনে, কয়টা এম-এ, পাশ তার মত পারে? আমি বাড়ীতে প'ড়ে বিদ্বান্ হ'ব। আমার বাপই সব বিষয়ে আমার আদর্শ। মা, তুমি বড় লোকের মেয়ে, এরূপ মহামনা ব্যক্তির স্ত্রী, তুমি এই সামান্য দুই চার হাজার টাকার জন্য আমাকে অল্প বয়সে সংসারে ডুবুবে?"

যোগেশ বাবুর উপর মৌখিক শত রাগ প্রকাশ সত্ত্বেও শতদল পুত্রের পিতৃভক্তিতে বাধা দিলেন না, তার চোখে জল এল। তাড়তাড়ি এক হাতে তা মুছে ফেলে বল্লেন, "তুই কি করতে চাস্!"

বিপিন। "মা আমাকে ছুটি দাও, আমি বিদেশে যাব ?"

মা। "আমি অনাশ্রয়, একা এরূপ বিপদে পড়েছি, এ অবস্থায় আমাকে ফেলে তুই যেতে চাস! আর যাবিই বা কোথায় ?"

বিপিন। "আমি থেকে তো তোমার উদ্বেগ বাড়াচ্ছি বই কমাচ্ছি না, যাব যেখানে প্রভু আমাকে নেবেন, আমি তারই হাতে আমাকে ছেড়ে দেব। তিনি জগতের ভার নিয়েছেন, আমার ভারে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন না।"

মা। "কোথায় যাবি ? যাবার খরচই বা পাবি কোথায় ?"

বিপিন। "মা, তুমি যে আমাকে রোজ একটি পয়সা মুড়ি কিনে খেতে দাও, তা এই সাত মাস আমি জমিয়েছি—তাতে আমার হাতে সাড়ে তিন টাকা জমেছে। আর রঘুপুরে তোমার পিসতুত ভাই রাধিকা গুপ্ত আমায় একটি টাকা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, এই সাড়ে চার টাকা হাতে আছে,—সংসারের যেরূপ টানাটানি, তাতে মনে হচ্ছে এই সাড়ে চার টাকা তোমাকে দিয়ে ফেলাই ভাল,—আমি ভিক্ষে করে, পথ খরচ চালাব।"

খাওয়ার যে কষ্ট, তার উপর জল খাবার একটা পয়সাও না ভেঙ্গে ছেলে নিজে শুকিয়ে তা জমিয়েছে, শুনে মায়ের মনটা ভেঙ্গে গেল। তিনি খুব কাঁদতে লাগলেন, এবং বল্লেন, "যে লোকের ছেলে সেই রকমটাই হয়েছিস। তুই এই প্রথম বয়স হ'তেই কষ্ট সুরু করেছিস্।"

আঠার বছরের ছেলে জোর ক'রে মায়ের কোলে বসে তার চোখের জল মুছিয়ে দিলে ; আদর করে মায়ের গালে চুমো খেয়ে বল্লে, "মা কেঁদ না, তোমার কান্না দেখ্‌লে আমার বুকটা ফেটে যায়।"

তার পরে সত্যি সত্যি একদিন বিপিন বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। মাকে ব'লে গেল, "সাহেবদের ছেলে কত দেশ দেশান্তরে চ'লে যায় তাদের মা বাপ তো কাঁদে না। তারা যেখানে যায়, জয়ী হয়ে

আমাদের ছেলেরা ছাগলের পালের মত সংখ্যায় বেড়ে যাচ্ছে—না খেয়ে মরতে। অথচ তোমাদের মত মায়েরা তাদেরে ঠুঠো জগন্নাথ করে বাড়ীতে রেখে বৃথা মায়া দেখাচ্ছেন।"

মা কেঁদে বলেন—"আমাকে কে দেখ্‌বে? তোর ক্ষুধা হ'লে কে তোকে খেতে দেবে?"

বিপিন বল্লে—"জগৎকে যিনি খাওয়াচ্ছেন, জগৎকে যিনি দেখ্‌ছেন—এত বয়স হ'ল, মা তার উপর তোমার বিশ্বেস নাই! আমি তো দেখ্‌ছি তিনি আমায় হাত ধ'রে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছেন, কখনও বালগোপাল সেজে আমাকে খেলা দিয়ে নূপুর বাজিয়ে নূতন পথে নিয়ে যাচ্ছেন, কখনও মা যশোদার গোপালের মত তোমার সঙ্গে আমার কত লীলা খেলা দেখাচ্ছেন, মা সর্ব্বদা যে তার মোহন বেণু আমার কানে বাজ্‌ছে। মা, দুর্গমে জঙ্গলে—নির্জ্জনে সহস্র ভয়ের স্থলে তিনি দশভুজা হয়ে আমাকে রক্ষা ক'রবেন, যেমন করে কংসের চরে পূর্ণ বৃন্দাবনের জঙ্গলে তিনি গোপ-বালক দিগকে রক্ষা করতেন। মা, আমি মনে মনে তার শরণ নিয়েছি, যার কটাক্ষে তৃণাবর্ত্ত, বকাসুর, অঘাসুর মারা পড়েছে। যার শ্রীপদ-পঙ্কজের নীচে স্থান নিয়ে কালীয় নাগের বিষ অমৃত হয়ে গেছিল। মা, তুমি রক্ষা মন্ত্র প'ড়ে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও, যেমন ক'রে মা যশোদা গোপালের মাথায় দিতেন, যখন গোপাল নাচ্‌তে নাচ্‌তে কংসের চর-গুলিকে ধ্বংস করতে যেতেন। আমি তাঁকে বলে রেখেছি, 'আমি নিজের সুখের জন্য যাচ্ছি না, আমি মায়ের দুঃখ দূর করতে যাচ্ছি, আমার দুটি বোনের দুঃখ মোচন করতে যাচ্ছি, আমি আমার পরমারাধ্য পিতার পাদপদ্মে শরণ নিতে যাচ্ছি।' তিনি আমার কানে কানে চুপে চুপে অনুমতি দিয়েছেন, এখন তুমি অনুমতি দাও, যেমন ক'রে শ্রীমন্তকে খুল্লনা অনুমতি দিয়েছিলেন, যেমন করে কৌশল্যা রামচন্দ্রকে ও দেবহূতি কপিলকে অনুমতি

দিয়েছিলেন, এবং যেমন করে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে শচীমাতা আমার প্রাণের ঠাকুর নিমাইকে অনুমতি দিয়েছিলেন। মা, তুমি কেঁদ না, আমি শত শত বিঘ্ন গ্রাহ্য করি না। কারণ আমি জানি সমস্ত অমঙ্গল ও বিঘ্ন যার কৃপাকটাক্ষে দূর হয়—তিনি আমার কাছে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছেন। আমি ভয় করি মা তোমার চোখের জলকে; এই চক্ষের জল একটা অলঙ্ঘ্য প্রাচীরের মত, এ ভেদ করে আমার দৃষ্টি বা গতি চলে না।”

সজল নত চক্ষে এই নব যুবক দাঁড়িয়ে মিনতি করে বিদায় চাচ্ছিল। মুহূর্ত্তকাল শতদলের মনে হ'ল এ তাঁর ছেলে নয়, পুত্রবেশে এ তাঁর ইষ্ট গুরু,—কে যেন তাকে বলাল,—তাঁর জিহ্বার উপর তার কোন অধিকার র'ল না,—তিনি বল্লেন “যাও, তোমার গতি শুভ হউক, তুমি শীঘ্র অভীষ্ট সিদ্ধ ক'রে ফিরে এস, তখন যেন আবার তোমার পূর্ণচন্দ্রের মত মুখখানি দেখে আমার চোখ দুটি সার্থক হয়।” পর মুহূর্ত্তে চেয়ে দেখেন, বালক চলে গেছে, সেই সাড়ে চার টাকা নিয়ে গেছে—তিনি পূর্ব্বরাত্রে বলেছিলেন, “যদি নিশ্চয়ই যাবি, তবে বাড়ীর একবিঘা জমি বন্ধক দিয়ে অন্ততঃ একশত টাকা দিয়ে দি, কলকাতায় কত লোক যাতায়াত করে, ওঁদের একজনের সঙ্গে যেতে পার্‌বি। বালক উত্তরে বলেছে “আমি তা চাই না, আমাকে তিনি যেমন নিরাশ্রয় করেছেন, আমি তেমনই নিরাশ্রয় হ'য়ে তার শরণ নেব। তাঁর সাহায্য ছাড়া আমি আর কারু সাহায্য চাই না। যিনি রাখ্‌লে পৃথিবীর কেউ কোন অনিষ্ট করতে পারে না, যিনি না রাখ্‌লে পৃথিবীর কেউ ধ'রে রাখ্‌তে পারে না, আমি তার আশ্রয় নিয়েছি। আমি সমুদ্রে পড়েছি, আমি নদী নালার খোঁজ নিতে চাই না। আমি মস্ত বড় একটা জায়গায় এসে পড়েছি—মা তুমি ভয় ক'র না, আমার পথ তিনি নিজে দেখিয়ে দিয়েছেন—আমি কারু কথা শুনব না।”

শতদল বুকে হাত দিয়ে দেখ্‌লেন, তার বুক খালি, খাঁচাটা পড়ে

আছে—পাখী উড়ে গেছে। বালক সেই পুঁথিগুলি, কয়েকখানি ছবির পাটা এবং দুই একখানি কাপড় ও সেই সামান্য টাকা কয়েকটা সম্বল ক'রে চলে গেছে। সে এমনই মনোহর কথা দিয়ে মাকে ভুলিয়ে গেল, তাঁর মনে হচ্ছিল যে তাঁর কাণে কেউ বৈকুণ্ঠের বীণা বাজাচ্ছিল। মুগ্ধ হয়ে চোখের তারা, প্রাণের পুতলীকে তিনি বিদায় ক'রে দিয়েছেন, সে কোথায় যাচ্ছে, কোন ঠিকানায় তাঁকে চিঠি লিখ্‌তে হবে, এ জিজ্ঞাসা করবার অবকাশ পর্য্যন্ত তিনি পান নি।

বিপিন চলে যাওয়ার পর—শতদল কতকটা সুখ-দুঃখে বিতৃষ্ণ হয়ে পড়্‌লেন! সারাদিন কেষ্টা বাগ্দীকে বাগানের কাজ দেখিয়ে দিতেন। সময়ে সময়ে মাটী নিজে কুপিয়ে তরিতরকারীর চারা লাগিয়ে দিতেন। রজনীগন্ধা অবধি ছোট একটা পিতলের ঘটিতে ক'রে জল এনে গাছের তলায় দিত। সুন্দরী রান্না কর্‌ত। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁদের কুটীরের চালে লাফিয়ে লাফিয়ে কুমড়া-লতা উঠ্‌তে লাগলে, একটা বাঁশের মাচায় লাউ ডগাগুলি তাদের সবুজ সৌন্দর্য্য দিয়ে বাগানের শ্রী ফিরিয়ে দিল। একদিকে কলাগাছ গুলি বড় হয়ে উঠলে, অপর দিকে আনারস তাঁদের কাঁটাপূর্ণ পাতা ও হলদে চক্র নিয়ে বাগানের শোভা বর্দ্ধন করতে লাগল। যখন রজনীগন্ধার একটা ঝাড় বাগানে লাগান হ'ল, তখন তো খুকী যেন কতকটা দিশে হারা হয়ে উঠল। তার নাম ধ'রে বাগানের কয়েকটা চারা গাছের কথা সবাই বলাবলি করে, সে কিছুতেই বুঝ্‌তে পারে না। তিন চার মাসের মধ্যে তাদের বাগান সবুজ শোভায় ভরে গেল। কুমড়োর হ'লদে ফুল, লাউ গাছের সাদা ফুল, এ সকল নিয়ে খুকী আর সুন্দরী কত যে তর্ক বিতর্ক করত—তা আর কি বল্‌ব! দুটা নেংড়া আমের এবং এবং একটা নেবুর কলমও নূতন জমি পেয়ে তেজালো হয়ে উঠ্‌ল।

কেষ্টা বাগ্দীর মাথায় বোঝা চাপিয়ে যখন শতদল, কুমড়ো, লাউ, বেগুন, কলা, আনারস প্রভৃতি তেনাইএর বাজারে পাঠিয়ে দিতেন, তখন বলে দিতেন, "তুই ভদ্রলোকদের বলিস্, রজনী চৌধুরীর মেয়ের ক্ষেতে এই সকল জন্মেছে, তিনি বাপের বাড়ীতে দুটি ভাত পান নি; ভাই তাড়িয়ে দিয়েছে, এগুলি যদি আপনারা কেনেন, তবে তাঁর মেয়ে দুটি নিয়ে চারটি খাবার মত ভাত হয়।"

এই ভাবে তিনি ভ্রাতার নিষ্ঠুরতার প্রতিহিংসা নিতেন, এবং এই ভাবে তার তিন বিঘার তরিতরকারী ও ফলমূল বাজারে বিক্রয় হ'ত। যে কালের যে ফসল, তাহা তিনি যথাসময়ে উৎপন্ন করতেন। লঙ্কা, ধনে, বেগুন, সিম ও অন্যান্য তরকারী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পেতেন। রোজ গড়ে আড়াই টাকার জিনিষ বিক্রয় হ'ত। মাসিক ৭৫৲ টাকায় পাড়াগাঁয়ে তাঁর বেশ চ'লে যেতে লাগ্‌ল। তাঁর নিজের জমি ছাড়া তিনি শ্যামা কলুর দুই বিঘা জমি বার্ষিক ৪৲ টাকায় ইজারা নিয়েছিলেন, সে জমি তার বাড়ীর সংলগ্ন ও প'ড়ে ছিল, কারণ শ্যামাকলু ম'রে যাবার পর, তার বিধবা স্ত্রী জমি দিয়ে কোন ফসল তৈরী করবার চেষ্টা করতে পারে নাই। পাঁচ বিঘায় এখন যা' পেতে লাগলেন,—শতদল বুঝলেন, তাতে তার সংসার বেশ চলে যাবে। তবে তিনি কৃষক রেখে ধান-চাল জন্মাবার মত একটা বড় কাজে হাত দিতে সাহসী হন নি।

এবার স্বামীর জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদতে লাগল, "তুমি মজুর হয়েছ, এবার এসে তোমার মজুরাণীকে দেখে যাও, এখন ভগবান আমাকে চুলে ধ'রে এনে তোমার মত স্বামীর যোগ্য করে দিয়েছেন। এখন বুঝেছি— লক্ষ্মী আমার ঘরের দোরে আচল ভরে খাবার নিয়ে ব'সে আছেন, আমরা তাঁকে অগ্রাহ্য করে দূরে দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।" কিন্তু যে স্বামীকে এরূপ গঞ্জনা ক'রে, তাঁর দেওয়া টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে আর কোন

লজ্জায় চিঠি লিখ্‌বেন। কেবল দিন রাত্রি চোখের জল ফেলে বলতেন, ঠাকুর তার মঙ্গল কর, একটী মশা তার গায়ের এক বিন্দু রক্ত খাওয়ার পরিবর্ত্তে যেন বনের সাপ আমাকে মেরে ফেলে; আমি তাঁর কোন কাজে লাগি নাই, কিন্তু আমার অন্তরের প্রেম অসীম—তা ঠাকুর তুমি প্রত্যক্ষ করচ।"

এদিকে সুন্দরী ত্রয়োদশ বর্ষে পা' দিয়েছে, তাকে ও তার মাকে দেখে কে না মনে করবে যে একজন লক্ষ্মী, আর একজন ভগবতী। খাটো লাল পেড়ে জোলার কাপড় পরা এই ত্রয়োদশীর চাঁদকে দেখ্‌লে চোখ জুড়ো'ত। সে সারাদিন রান্না ঘরে খাটে, তবুও তার গায়ে একটু কালী নাই, সেই পড়ে এতটুকু দাগ নাই। তারা এখন আর সরু চালের ভাত খায় না, লাল লাল খৈয়ের মত মোটা ভাত, তা খেয়ে সুন্দরীর দেহের লাবণ্য কেমন ফুটেছে—পল্লীলক্ষ্মী যেন তার মুখে চোখে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন।

সুন্দরী দুপুর বেলাটা ভ'রে তার মায়ের কাছে ব'সে প'ড়ে, সে বাঙ্গলা অনেক বই পড়ে ফেলেছে। মাসিক ৵০ আনা চাঁদা দিয়ে সে তেনাই পাব্লিক লাইব্রেরীর গ্রাহক হয়েছে। এদিকে তার পিতার বড় আদরের টেনিসন, এবং ব্রাউনিং তাঁদের বাড়ীতেই আছে—শতদল নিজে ভাল লেখাপড়া শিখেছিলেন, মেয়েকে প্রাণ দিয়ে শিখুতে লেগে গেলেন। সুন্দরী এখন টেনিসনের ডোরা,. ওয়ার্ডসোয়ার্থের লুসি গ্রে, এবং কোলরিজের দি ওল্ড ম্যারিনার থেকে অনেকাংশ মুখস্থ বল্‌তে পারে, রবিবাবুর কাব্যগ্রন্থ সে অনেকবার পড়েছে, এবং বিপিন তাঁকে বৈষ্ণবদের অপূর্ব্ব পদাবলী পাঠে দীক্ষিত ক'রে গেছে।

এত কষ্টে পরেও শতদল তাঁর সেলাইএর কলটি বিক্রী করেন নাই। সুন্দরী ছেলেদের জামা, সেমিজ প্রভৃতি বেশ ভাল ক'রে সেলাই করতে শিখে ফেলেছে।

এই ভাবে এই ক্ষুদ্র পরিবারটি অভাবের মধ্য দিয়ে শিক্ষা পেতে লাগ্‌লেন। ইহাঁরা বঙ্গীয় পল্লীর সেই সাধনা—যা নিজের খাওয়ার চাইতে পরের খাওয়ার প্রতি বেশী দৃষ্টি রাখে; যাতে যিনি রাঁধেন তিনি সকলের শেষে খান, অতিথি এলে তাঁকে খাইয়ে দাইয়ে যদি কিছু না থাকে, তবে শীর্ণ মুখে মধুর হাসিটি দিয়ে নিজের দৈহিক কষ্ট প্রচ্ছন্ন রেখে উপবাস দ্বারা আত্মার বল সঞ্চয় করায়, যে সাধনা মানুষকে অবিরত কার্য্যে নিযুক্ত রেখে ও ভগবানের পাদ-পদ্মে বিকিয়ে রাখে—যাতে সহরের দুষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা, স্বার্থপরতা, ও হীন নির্ম্মমতা নেই—সেই সাধনা মাথা পেতে নিয়ে শতদলের প্রাণে দুর্জ্জয় অভিমানের জায়গায় শান্তি, বিলাসিতার স্থলে কঠোর বৈরাগ্য জেগে উঠ্‌ল।

কেবল বিপিনের কথা মনে হ'লে লুকিয়ে লুকিয়ে মাতৃবক্ষে হাহাকার উঠত। সে কোথায় গেল, কেমন আছে, ভাবতে শতদল চোখে সরষার ফুল দেখ্‌তেন, কোন চিঠিই তো লিখ্‌লে না। বিদায়ের সময় তার দেবমূর্ত্তি ও স্বর্গীয় উপদেশের কথা যতই মায়ের মনে উদয় হ'ত, ততই বুকে যেন শেল বিঁধত।

তখন চৈত্রমাস, শতদলের হাতে প্রায় ৪০০৲ টাকা জমে গেছে। তা থেকে ৫০৲ টাকা নিয়ে তিনি বল্লেন, "আমি এবার বাড়ীতে দোল করব। রজনীগন্ধা উৎসবের গন্ধ পেয়ে একেবারে কলরব করে উঠ্‌ল। বাড়ীতে দোল হ'ল, পাড়ার শিশুরা এসে কাকলী করতে লাগল। আবীরে আবীরে বাড়ীর পথ রাঙ্গা হয়ে উঠল, ছেলেদের শতদল নিজে রেঁধে খাওয়ালেন। রাধা-কৃষ্ণের যুগল মৃন্ময় মূর্ত্তি আবীরে রঞ্জিত হ'য়ে দোলায় দুলতে লাগল, শতদল গলবস্ত্র হয়ে বল্লেন, "ঠাকুর, তুমি তাকে কোথায় নিয়েছ, আমি জানি না। সে ব'লে গেছে তুমি তাকে নিয়েছ, আমি তার কথা অবিশ্বাস করতে পারি না। তুমি তাকে দে'খ, রে'খ।" এই বলে তিনি রাধাকৃষ্ণের

আবীর-রঞ্জিত পাদপদ্ম স্পর্শ করলেন, তখন মনে হ'ল সেই পাদপদ্ম বিপিনের দেহের মত কোমল। শতদল আত্মহারা হয়ে সেই দোলমঞ্চের নীচে প'ড়ে রইলেন।

১৩

তেনাই হ'তে তিন ক্রোশ হেটে এসে বেলা দুই প্রহরে বিপিন এক বামুনবাড়ীতে খেয়ে—তাদের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়ে নিলে। চৈতন্যের সংকীর্ত্তনের ছবিগুলি দেখিয়ে সে তাঁর জীবনের কথা এমনই সুমধুর ভাবে বল্‌তে লাগল যে পাড়ার অনেক ছেলে তাঁর কথা শুন্‌তে সেই বামুন বাড়ীতে জড় হয়ে গেল। বুড়দের মধ্যে কেউ কেউ তার কথা শুনে চোখের জল সামলাতে পারলেন না। সেই গ্রাম খানি ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে তার আপনার হ'য়ে গেল। তরুণ অতিথিকে নিয়ে দস্তুর মত কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। গ্রামটির নাম আঠারঘর, সেখানে রমেশ চন্দ্র সেন নামে একজন লোক এসেছিলেন তাঁর বন্ধুর বাড়ীতে। তিনি কৃষ্ণনগরের ডেপুটি, অধ্যাপক রামশরণ চক্রবর্ত্তীর তিনি বিশেষ বন্ধু ছিলেন, রামশরণ শঙ্কটাপন্ন পীড়িত হয়ে বন্ধুকে 'তার' করেছিলেন। রমেশবাবু এই উপলক্ষে আঠারঘরে ছুটি নিয়ে এসে এক সপ্তাহ ছিলেন। তাঁর বন্ধুর সঙ্কটের অবস্থাটা দৈব ইচ্ছায় কেটে গেছে। রমেশ বাবু পরদিন প্রত্যূষে কার্য্যস্থলে রওনা হবেন।

যারা সেই দুই ঘণ্টার মধ্যে বিপিনের ভক্ত হয়ে গেছিল, তার মধ্যে ছিল সুরেশ—রমেশ বাবুর অষ্টাদশ বর্ষীয় পুত্র। সে তার পিতার সঙ্গে এসেছিল। সুরেশ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে কৃষ্ণনগর কলেজে আই, এ, পড়্‌ত। তিন চার ঘণ্টার মধ্যে বিপিনের সে এমনই ভক্ত হয়ে পড়্‌ল যে সে গিয়ে তার বাপকে বল্লে—এমন একটি ছেলে দেখে এলুম যার জোড়া

মেলা ভার। পিতা কৌতুহলী হয়ে বিপিনকে ডেকে পাঠালেন—রমেশ বাবু বল্লেন "তোমার বাড়ী কোথায়, কি জন্ত এসেছ?" বিপিন সংক্ষেপে তার অবস্থা জানাল। "তুমি এত অল্প বয়সে উপার্জ্জন কি করবে?" এই বলাতে বালক দৃঢ়ভাবে জানাল "চেষ্টা করে দেখ্‌ব; মা বোন কষ্ট পাবেন। আমি ব্যাটা ছেলে হয়ে তাই ব'সে ব'সে দেখ্‌ব? ফলাফল তো আমার হাতের মুঠোর ভিতর নয়, আমি চেষ্টা করব বলে বা'র হয়েছি।"

রমেশবাবু দেখলেন, তার সুন্দর তরুণ মূর্ত্তি যেন একটা তেজে উদ্ভাসিত। তিনি মানব-চরিত্র বুঝতে পার্‌তেন, বালককে বল্লেন, "তুমি আমার সঙ্গে কৃষ্ণনগর যাবে?"

"আমার হাতে ৪৷৷৹ টাকা আছে, এতে যদি যাবার খরচ কুলোয় তবে যেতে পারি।"

রমেশবাবু "তোমার খরচের জন্ত ভাব্‌তে হবে না, তুমি আমার বাড়ী গিয়ে থাক্‌বে, তার পর উপার্জ্জনের যা চেষ্টা তা করবে।"

বালক কৃষ্ণনগর নবদ্বীপের অতি নিকটবর্ত্তী জেনে তাঁর সঙ্গে যেতে উৎসাহী হয়ে উঠ্‌ল।

রমেশ বাবু দেখলেন, বালক খায় অতি সামান্ত—তাও নিরামিষ। সহস্র চেষ্টা করেও কেউ তাকে একখানি ভাল সন্দেশ বা মেঠাই খাওয়াতে পারে না। সেই আধ পয়সার ছোলা ভাজা বা মুড়ি দিয়ে জলপান ক'রে, শুধুপায়ে চলে, আটহাতি লালপেড়ে জোলার ধুতি তাহার পরণে—তথাপি তার চেহারাটি গন্ধর্ব্বের মত সুন্দর। গৌরবর্ণ মুখ খানি ঘিরে কোকড়ানো কোকড়ান চুল ঝুলে পড়েছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লাবণ্যময়,—অতি নম্র মূর্ত্তি, মাথায় জটা নেই, হাতে কমণ্ডলু নেই, তবুও যেন সে একটি তরুণ সন্ন্যাসী।

কৃষ্ণনগরে যখন রমেশবাবু তাকে নিয়ে এলেন,—তখন তার স্ত্রী

রমাদেবীর সমস্ত ক্ষুদিত প্রাণের বাৎসল্য গিয়ে পড়ল, ছেলেটির উপর। তাঁদের ১৫।১৬ বৎসরের একটি ছেলে মারা গিয়েছে। বিপিনকে দেখা-মাত্র রমার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল,—মনে হ'ল অজিৎ ফিরে এসেছে, আজ দুই বছরের পরে তার কান্না ও ডাকে না থাকৃতে পেরে মায়ের ধন মায়ের কোলে ফিরে এসেছে।

বিপিন ভাবলে "আমি মূর্খ, ভাবছিলুম, আমার একটি মা, তিনি তেনাই বসে কাঁদছেন,—জগৎজননী যে সর্ব্বত্র, তিনি আবার মা হ'য়ে আমার পেছনে পেছনে এখানে এসেছেন।"

রমেশ বাবু বল্লেন, "বিপিন তুমি কি কলেজে পড়্বে? তা হ'লে বল আমি কৃষ্ণনগর কলেজে তোমায় ভর্ত্তি করে দেই। কিন্তু বছরের তো অনেকটা চলে গেছে, এবার তো পারসেণ্টেজ্ থাক্‌বে না। দুটি বছরই ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়্তে হবে।

বিপিন। "আমার পড়ে কাজ নেই, কলেজে পড়া সুরু কর্লে আমাকে ৫।৬ বছরের জন্য কলেজেই পড়তে হবে—এর মধ্যে আমার বোনের বিয়ে দিতে হবে এবং সংসারের সাহায্য করতে হবে।"

রমেশবাবু। "তবে অপেক্ষা কর, দেখি আমি তোমার উপার্জ্জনের জন্য কি করতে পারি। নেহাৎ কচি বয়েস!"

রমাদেবীর এখন একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। সুরেশ কলেজে পড়ে এবং বার বছরের মেয়ে সুহাসিনী বালিকা-বিদ্যালয়ে প'ড়ে।

কৃষ্ণনগরে আসার পর থে-ক সেই পাঁটায় আঁকা চৈতন্যের সংকীর্ত্তনের ছবি নিয়ে সে দিন রাত ব্যস্ত থাকে, সে বড় কাগজের একটা খাতা ক'রে ঐ ছবি গুলির নকল করৃতে থাকে। একদিন সুহাসিনী বল্লে "বিপিনদা, তুমি যেগুলি নকল কচ্ছ, তার চাইতে ও তোমার হাতের আঁকা ছবি অনেক ভাল হয়েছে। তুমি নিজে নিজে আঁকৃলেই পার। তোমার তুলির

টান খুব ভাল, চেহারা আঁকবার শক্তিও বেশ। তবে ঐগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখে আঁক্‌তে থাক?"

বিপিন। "ঠিক বল্‌ছ, সুহাসিনী, আমার ছবি ঐ পাটার ছবির থেকে ভাল?"

সুহাসিনী। "ঠিক বলছি না, তবে কি বেঠিক বলছি? তুমিই চেয়ে ত্থাখ না, ঐ যারা নাচ্‌ছে তাদের পাগুলি কেমন ব্যাঙের মতন, তাদের মুখগুলি কেমন অস্বাভিক, চোখ্‌গুলি ডাগর ডাগর, ভুরুতে কত কালি ঢেলেছে—আর গাছ যে এঁকেছে তা তো একটা একটা ডাল এঁকে তার উপর কতকগুলি রং ঘষে দিয়েছে, না হয়েছে লাইট্‌ সেড্‌, না হয়েছে পাতা। আর তোমার গাছগুলি ও মূর্ত্তিগুলি কেমন সুন্দর, স্বাভাবিক!"

বিপিন। "তুমি এই পাটার ছবির মধ্যে একটা ভাব দেখ্‌তে পাচ্ছ না, মূর্ত্তিগুলি যেন আনন্দ দিয়ে গড়া হয়েছে। মহাপ্রভুর মুখ দিয়ে আনন্দ যেন ঢল্‌কে ঢল্‌কে পড়ছে, তুমি দেখ্‌ছ হাত পা—আমি দেখ্‌ছি ঐ আনন্দের ভাব'টা। গাছগুলির পাতাগুলি ঠিক এখনকার ছবির মতন হয় নি—কিন্তু এই সংকীর্ত্তনের আনন্দ যেন সেগুলি নিঝুম হয়ে উপভোগ কর্‌ছে। ঐ যে হরিণগুলি পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধমুখ হয়ে সেই আনন্দের ছবি দেখ্‌ছে।

"আর ঐ যে তুমি যাকে ব্যাঙের মত পা বল্লে, ওদের ঐ পায়ে কি আনন্দের উদ্দণ্ড নৃত্য সূচনা কচ্ছে, তা ব ঝছ? খোলওয়ালা কতটা দাপটে খোল বাজাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন তার সমস্ত শরীরটা লাফিয়ে সেই বাজনার তাল রক্ষা কচ্ছে।

"সুহাসিনী, আমি তেমন ভক্তি পাব কোথায়? আমি যে এই আনন্দের রাজ্যে মুষ্টি ভিক্ষার কাঙ্গাল, আমার মূর্ত্তিগুলির সাজ গোজ হয়েছে, তারা সভ্য ভব্য হয়েছে, কিন্তু আমি যে সে আনন্দের আভাষটুকুও দিতে

পাচ্ছি না, তারা এই সংকীর্ত্তনের হাটে বসে বসে ছবি এঁকেছেন, আমার হাতে তো সে আনন্দ আসছে না?"

এই বলে তুলি ফেলে দিয়ে চিত্রকর বিষণ্ণ মুখে বসে পড়লেন, তার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে গণ্ডে পড়্‌ল। সুহাসিনী সেই চোখের জলের ভিতর দিয়ে তার তরুণ পাবনমূর্ত্তি দেখতে পেল, তার কোঁকড়ান চুল,—তার বৃহৎ আনত চক্ষু পল্লব, এবং দুটি সুন্দর কম্পিত ওষ্ঠাধর এসমস্ত ব্যেপে একটা দেবভাব প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল, সুহাসিনী ভাবল এ দেবতাকে কে আমাদের দুয়ারে এনেছে? এযে হেলায় অশ্রদ্ধায় আমরা যা খাইনা, সেই মোটা চালের ভাত ও একটু ডালসিদ্ধ দিয়ে খেয়ে থাকে, আর কিছু চায় না। দেবতা কি আমাদের শ্রদ্ধার ত্রুটি দেখে দান নিতে অসম্মত হয়েছেন?

সেই দিন থেকে সুহাসিনী বিপিনের থালে যে উচ্ছিষ্ট পড়ে থাকৃত, তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করৃত, ঐ তার মহাপ্রসাদ। যদি লজ্জা সঙ্কোচ বলে কোন জিনিষ না থাকত, তবে সেই প্রসাদ খেয়ে সে জীবন কাটাতে পারত। কিন্তু তথাপিও সেই দিন থেকে সে আস্তে আস্তে ভাল খাবার ভাল পরবার ইচ্ছা ছেড়ে দিল। "মা, বিপিনদা যে মোটা ভাত খায়, আমার তাই বড় খেতে ইচ্ছা করে" এই বলে আদুরে মেয়ে এমনই আবদার করত, যে রমাদেবীকে তাই দিতে হ'ত। আস্তে আস্তে—তার মনের ভাব অপরকে জান্‌তে না দিয়ে সুহাসিনী বিপিনের স্বভাব-সিদ্ধ বিরাগের তপস্যার দীক্ষা নিজে গ্রহণ করতে লাগল।

তারও তো মূর্ত্তিখানি নিটোল সুন্দর, তারও তো চুলগুলি পৃষ্ঠ ছাপিয়ে ঝুলে পড়েছে। তাদেরও অগ্রভাগ কোকড়ানো কোকড়ান, তারও বর্ণটি "স্ফুট চম্পক দল নিন্দিত," কিন্তু কই বিপিনদা তো একবারও তার রূপের দিকে চেয়ে দেখে না, তথাপি সে কেন কপাটের আড়াল থেকে চুরি

করে বিপিনের তরুণমূর্ত্তির প্রতি বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, তার মনোবীণা কেন বিপিনের কথা শুনলে আনন্দে নেচে উঠে? বিপিন যে পথে হাটে, সে কেন সেই পথের ধূলি নিয়ে নির্জ্জনে মাথায় ঠেকায়। একি ভালবাসা না ভক্তি?

কিষণ লাল নামক এক ধনবান মাড়োয়ারী কৃষ্ণনগরে থাকতেন। তিনি বিপিনের রূপ-গুণে বিশেষরূপ আকৃষ্ট হলেন। বিপিন কথনও কথনও তাঁর কাছে বসে আলাপ করত। তাদের দুইজনের আলাপ এমনই জমে উঠত, যে কে বুঝতে পারবে যে কিষণ লালের বয়স ৬০ এবং বিপিনের বয়স ১৮। কোন কোন প্রকৃতি আছে—তা বুড় হ'তে জানে না,—তাদের ভিতর একটা বালকের স্ফূর্ত্তি চিরকালই বজায় থাকে। সংসারের ঝড় তুফান বয়ে গেছে, দাঁতগুলি নড়বড় হয়েছে, চুল পেকেছে কিন্তু হ'লে কি হয়? বালককে লাফাতে দেখ্‌লে সে বুড়রও লাফাতে ইচ্ছা হয়, তার হৃদয় বলে জিনিষটা ঠিক তরুণই রয়ে গেছে। কিষণলাল ছিল তেমনই প্রকৃতির লোক। বিপিনকে দেখে তার ছেলে বেলাকার খেলাধূলার কথাতো মনে প'ড়ে যেতই, তাঁর পিতা সুখলাল যে অপূর্ব্ব ভক্তির সঙ্গে বৃন্দাবনের গোপালজিব মন্দিরের ধুলোয় প'ড়ে গড়াগড়ি দিতেন, তাও মনে প'ড়ে যেত, এবং ভাগবতে বালগোপালের চুরি ক'রে যে ননীমাথন থাওয়ার কথা লেখা আছে—সে সমস্তই তাঁর স্মৃতি পথে আস্‌ত। বিপিনের মুখখানি চির-প্রফুল্ল, তার কথা বার্ত্তা এ সংসারের বাজে বিষয় ভুলিয়ে দিত। যা কিছু কিশোরের—সবুজ ও তরুণ তাই মনে এনে বুড়োর হিসাব কেতাব উলটপালট করে দিত।

এক এক সময় কিষণলাল মনে করতেন, ভগবান তার চিরকালের ডাক এই একবার শুনেছেন। তাঁকে পুত্র দেন নাই, কন্যা দেন নাই, কিন্তু এ কে? কোথেকে এসে তার হৃদয়ের সমস্ত বাৎসল্য রস মিটিয়ে দিচ্ছে,

একে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখতে ইচ্ছা হয় কেন? এ আমার কে? কেউ নয়। তথাপি এই ছেলেটি এসে আমার মন হরণ করছে কেন? এক এক সময়ে তাঁর মনে হ'ত তার যথা সর্ব্বস্ব বিপিনকে লিখে প'ড়ে দেন। কিন্তু সে অর্থের চেষ্টায় এসেছে—একথা মুখে বলে, তার তো অর্থ-লিপ্সা আদৌ নেই। কখনও কিষণলাল তাকে কোন ভাল সামগ্রী খাওয়াতে পারেন নি, কতবার দামী কাপড়, জামা, উর্দ্দী, জুতো উপহার দিয়েছেন, বিপিন গোপনে তা' অপরকে দিয়ে ফেলেছে। শেঠজি তা জানতে পেরে মনে মনে কষ্ট পেয়েছেন। টাকা পয়সা দিতে চাইলে সে বিরাগের ভাবে বলেছে "শেঠজী, এ সব করেন তো আমার ছুটি, আমি আর আস্‌ব না।" প্রকৃতি যে একে সন্ন্যাসী ক'রে গড়েছে, একে গৃহী করবে কে? এ ছেলে যে নিত্যমুক্ত, অভাব হীন নিজের ভিতর পূর্ণতার সন্ধান পেয়েছে, এর অভাব সৃষ্টি করবে কে?

কত ছেলে তো পথে হাত পেতে আছে। "একটি পয়সা দাও বাবা," "কাঙ্গালের দিকে মুখ তুলে চাও বাবা" "আল্লাকে রহপর, খোদাকো রহপার" প্রভৃতি চীৎকারে তো রাজপথে চলা ভার। কিষণলালের প্রাণ দয়ায় ভরপুর, দয়ার বিশালক্ষেত্র তো তার চোখের সামনে। কিন্তু যাকে দিলে, যে গ্রহণ করলে, মনে হয় তাঁর জীবনব্যাপী অর্থ-উপার্জ্জনের চেষ্টা সার্থক হয়েছে, সে তো কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না। সে হেসে খেলে তার মাথা ঘুরিয়ে দেয়, সে সনাতনের বৈরাগ্যের কথা এমনই ভাবে বলতে থাকে যে কিষণলালের হৃদয়ে ভোগের তৃষ্ণা, অর্থলিপ্সা ক্ষণকালের জন্য শুক্‌নো ফুলের মত ঝ'রে পড়ে যায়।

এদিকে বিপিন একটি দিনও অকর্ম্মা হয়ে ব'সে থাকে নি। সে কৃষ্ণনগরে ঘুর্নিপাড়ায় গিয়া পুতুল তৈরী করা শিখছে। ছবি আঁকায় তাঁর একটা অশিক্ষিত পটুতা জন্মেছে। তার আঁকা ছবি দেখে কেউ এটা

মনে করতে পারে না যে আর্ট স্কুলে না শিখে কেউ এমন সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। তার বিশেষত্ব ছিল মনের ভাব দেখাতে। যখন কোন ভক্তের কিম্বা প্রেমিকের ছবি সে আঁকত, তার চোখে মুখে এমনই একটী ভাব দিতে পারত, যে ছবিখানি দেখ্‌লে আপনা আপনি চোখে জল আসত। অশোক-বনে সীতার একখানি ছবি সে এঁকেছিল। ছবির অধর দুটি যেন হাওয়ায় কুন্দফুলের মত আবেগে কাঁপছিল। সীতার মুখে এক দিকে জ্বলন্ত তেজ ও বৈরাগ্য এবং অপর দিকে করুণ স্বামী-বিরহ এমনই সুস্পষ্ট হয়েছিল যে বাল্মীকির সমস্ত কাব্যকথা যেন তুলির আগে ফুটে উঠেছিল।

বিপিনের এই ছবি একজন বণিক ৫০৲ টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিল, এই টাকা বিপিন রমাদেবীর নিকট জমা রেখেছিল। সুরেশ বল্লে—"বিপিন, এ টাকাটা তোমার মাকে পাঠিয়ে দাও না কেন?"

বিপিন "তাঁকে এখনও টাকা পাঠাবার দরকার হয় নি।"

সুরেন "সে-কি? তুমি তার অবস্থার কথা যা' বলেছিলে, তাতে মনে হচ্ছিল তাঁর খুবই অভাব।"

বিপিন বল্লে "আমার আস্‌বার সময় তাঁর একটা অভাবের অবস্থা আমি দেখে এসেছিলাম সত্য, কিন্তু তখন তাঁর বাগানের শাকসব্জীর যেরূপ অবস্থা দেখে এসেছিলুম, তাতে স্পষ্ট বুঝেছিলুম—দুই এক মাস পরে তার আর কোন অভাব থাক্‌বে না। তিনি বাগানের আয় দিয়ে চালাতে পারবেন, তিনি অতি তেজস্বিনীও দৃঢ় চরিত্র। আমি সেই বাগান দেখে যদি বুঝতুম—তাঁর আয় দাঁড়াবে না, তবে তাঁকে ফেলে চলে আসা আমার হয়ত হ'ত না। তার পরে তাঁর দুর সম্পর্কে মামাত ভাই হরকিশোর গুপ্তের সঙ্গে আমার গোপনে অনেক কথাবার্ত্তা হয়েছিল। যদি মায়ের অবস্থা বিশেষ খারাপ হয়, তবে তিনি বৃন্দাবনে আমার দাদাম'শায়কে খব

দেবেন, তা হ'লে একটা ব্যবস্থা হবেই কি হবে। কিন্তু বড় মামার সঙ্গে পাছে তাঁর আবার মনান্তরটা বেড়ে যায়, এজন্যে যথাসাধ্য আমরা নিজেরা চেষ্টা করে বেঁচে থাক্‌ব, তাঁকে বিরক্ত করব না। নেহাৎ অসমর্থ হ'লে তাঁকে জানান হবে। হরকিশোরবাবু আমাকে বলেছেন 'তোমার মায়ের জন্য চিন্তা কো'র না—আমি খুব সজাগ রইলুম, তাঁর কোনরূপ বিশেষ অভাব হ'লে টাকা ধার দেওয়ার ছলে আমি সাহায্য করব।'

"দে'খ আমি এসে তাঁকে একখানি চিঠিও দেই নাই। কতবার চিঠি লিখ্‌তে প্রাণে চেয়েছে, তথাপি জোর ক'রে মনের ভাব নিরস্ত করেছি, তার কারণ তিনি আমার ঠিকানা জান্‌তে পারলে তখুনই এখানে চলে আস্‌বেন। তিনি আমাকে ছেড়ে কি কষ্টে আছেন, আমি প্রাণে প্রাণে বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি একটা কিছু স্থায়ী রকমের উন্নতি না ক'রে তাকে কিছুতেই খবর দিব না। এ দেশের মায়েদের অতিরিক্ত স্নেহের দরুণ ছেলেরা নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াতে শিখে না। চিরকাল কতকট পঙ্গু থেকে যায়। যাতে এই বৃথা মমতার প্রশ্রয় দিয়ে আমি গুলিয়ে না যাই—তাই আমি চেষ্টা কচ্ছি, তাতে তিনি আমি উভয়েই বিষম কষ্ট পাচ্ছি; কিন্তু তিনি আমাকে যা কর্ত্তব্য বলে দেখিয়ে দিচ্ছেন, শত কষ্ট সয়েও আমাকে সেই পথে চল্‌তে হবে।"

সুরেন। "তুমি কি করবে ঠিক করেছ?"

বিপিন। "সে-যে কি করব তা কিছু ঠিক করিনি, আমি চেষ্টা করি, ঠিক সিউলী ফুলগাছটির মত একেবারে আমার যা কিছু তা সমস্ত প্রতি প্রত্যুষে তাঁরই পাদপদ্মে ডালি দিয়ে রিক্তহস্তে দাঁড়াতে। আমি এক দিনের পর আর একদিন তারই মুখাপেক্ষী হয়ে চল্‌বার পথ চিন্‌তে চাই। কোন একটা পথ ঠিক করে রাখি নি, না বুঝে ঠিক ক'রে গোঁ ধ'রে এক পথে চল্লে পাছে ভুল ভ্রান্তি হয়—তার নির্দ্দেশকে অমান্য ক'রে পাছে

সংস্কারাধীন হয়ে নিজের গোঁ-টাকে বড় করে দেখি,—এই জন্য প্রত্যহ যে পথে চল্‌ব, প্রত্যহ তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে লই। সুরেশ দা, তুমি অকপটে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, নিজকে ভুলে তাঁর শরণ নিয়ে তাঁকে পথের কথা জিজ্ঞাসা কো'র, তিনি ঠিক পথে ব'লে দেবেন।"

এমন সরলভাবে সাশ্রু চোখে বিপিন এ সকল কথা ব'লতে লাগলে—সুরেশ মনে কর্‌লে যেন নারদ বীণা বাজিয়ে বৈকুণ্ঠের পথ ব'লে দিয়ে গেলেন।

১৪

বিপিনের হাত পুতুল তৈরী করতে আরও বেশী দক্ষতা দেখাতে লাগ্‌ল। সে মহাপ্রভুর একখানি মূর্ত্তি তৈরী করলে, তাতে গলদশ্রু নেত্র নদের ঠাকুর এমনি হাতের ভঙ্গী করে স্বর্গের দিকটা দেখাচ্ছেন যে সেই হাতের ভঙ্গীর থেকে যেন কত মধু ঝরে পড়ছে—যেন অমৃতের সন্তানদিগকে অমৃতের পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। কুমোরেরা বলাবলি করত—এই ছেলের নৈসর্গিকী শক্তি আছে, আমরা বুড়ো হয়ে গেলুম, কিন্তু এ ছেলের তুলির এক টানে যা আঁকে, আমরা ভেবে পাই না, এরূপ সূক্ষ্ম টানে একেবারে একটা ভাবকে মূর্ত্তিমান করতে এ শিখ্‌লে কি ক'রে?

বিপিন মাঝে মাঝে ছবি ও মূর্ত্তি বিক্রী করেছে—তাতে দুই একশ টাকা যা' পেয়েছে তা' সে রমাদেবীর কাছে জমা দিয়েছে। কিন্তু এখন সে আর বিক্রী করে না। সে কিষণলালের সঙ্গে দুই একবার নবদ্বীপ গেছে। সেখানে কতকগুলি মুদি দোকান, ষ্টেসনারী ও খাবারের দোকান আর আজকাল খুব বড় বড় দ্বিতল ত্রিতল বাড়ী উঠেছে। সে সুরধুনীতীরে আর মৃদঙ্গ তেমন ক'রে বাজে কোথায়—যে মৃদঙ্গের ধ্বনি জগতে আনন্দের ঢেউ

বহিয়ে গেছে—যে মৃদঙ্গের শব্দে জগাই মাধাইএর পাষাণ প্রাণ গলে গেছিল,—জগাই বলেছিল 'মাধাই, আমার আজ কি হ'ল? রোজ রোজ ত এই খোলের বাদ্য শুনলে মনে হ'ত কর্ণ বিদীর্ণ হ'য়ে যায়—খোল লাঠির বাড়ীতে ভেঙ্গে ফেলি, আজ আমার এ কি হ'ল? আজ কেন ঐ ধ্বনি শুনে মাটীতে গড়াগড়ি দিতে ইচ্ছে হয়, আজ কেন ঐ শব্দে চোখের জলে পথ দেখতে পাচ্ছি না—সেই মৃদঙ্গের শব্দ যার তালে তালে রোমাঞ্চ, ভক্তের অশ্রু, কোথায় সেই মৃদঙ্গের ধ্বনি, কোথায় সেই প্রাণের ঠাকুর নিমাই, যিনি ভক্তিগঙ্গাকে শিবের জটাজুট হ'তে বার করে এনে লোকের দোরে দোরে বইয়ে দিয়েছিলেন,—এ নবদ্বীপে সে সকল কোথায়? ছেলে দোকান থেকে মুড়কি কিনে খাচ্ছে, ঘড় ঘড় শব্দ করে, গাড়োয়ানের তালু ও কণ্ঠের সহযোগে একরূপ উৎকট শব্দের সঙ্গে গো শকট পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে, বাজারে মেছুনীরা মাছের ভাগা নিয়ে খদ্দেরের সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছে, প্রভুর বাড়ীঘর গঙ্গা নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে জুড়োচ্ছেন—তার তো কোন চিহ্ন নাই।

কিন্তু অন্যের কাছে যেরূপ হউক বিপিনের চোখে নবদ্বীপ—স্বর্গ। এই সেই স্থান যেখানে ভগবান্ বাঙ্গালীর রূপ ধ'রে, আমাদের মত ধুতি চাদর পরে, জগত তরাতে এসেছিলেন,—এইখানে শ্রীবাসের খোলা নিয়ে টানাটানি করেছিলেন, এইখানে হাস্‌তে হাস্‌তে কেশব কাশ্মীরীর দর্পচূর্ণ ক'রেছিলেন, এইখানে শ্রীমান পণ্ডিতের কাঁধে ভর করে কৃষ্ণকথা বল্‌তে বল্‌তে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, এইখানে বাসুদেবকে কোলে করে সংস্কৃত শিখাতেন, এইখানে টোলে ব্যাকরণ পড়াবার সময় মুকুন্দের মুখে শ্লোক আবৃত্তি শুনে পুঁথির পাঠ বন্ধ করে পাগল হয়ে ছুটেছিলেন, এইখানে গঙ্গার উপর তার পাঁচখানি বড় ঘর দাঁড়িয়েছিল এবং খর্ব্বাকৃতি মূর্ত্তিমতী ধৈর্য্য ও শান্তি শচীদেবী সারাদিন নিমাই নিমাই ব'লে ডাকৃতেন—এইখানে

এই শরীর যদি তোমার তীর্থে এ ভাবে যায় তবে ত জীবন ধন্য হ'বে, হা হা—মহাপ্রভুর স্থান! এখানে কি পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়।" কিষণলাল দেখ্লেন, এতগুলি স্ত্রী-পুরুষ যদি দেড় মাইল এ ভাবে চলে তবে তো মারা যাবে, এই গাটরি বোচকা অপগণ্ড শিশুগুলি লয়ে বুকে হেটে তারা চলছে, আর চোখ দিয়ে ধারা বয়ে যাচ্ছে। কিষণলাল অনেক ক'রে বুঝলেন "ও বাবু ছেলে মানুষ ও ঠিক বুঝ্তে পারে নাই—নবদ্বীপ এখনও বহুদূরে" রাস্তার একজন লোককে ডেকে এনে প্রমাণ খাড়া করে তাঁদের তিনি ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন, নবদ্বীপ আরও অনেকটা হেটে গেলে পাওয়া যাবে। তার পর তারা বুকে হাঁটা ছেড়ে দিয়ে পায়ে হাঁটতে লাগল, এবং বারংবার বল্লে, যেখান থেকে মহাপ্রভুর মন্দির দেখা যাবে সেখান থেকে তারা বুকে হেঁটে যাবে—এ যেন ব'লে দেওয়া হয়।

বিপিন এদের ভক্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

কৃষ্ণনগর ফিরে এসে বিপিন মহাপ্রভুর এক সেট মূর্ত্তি গড়তে লাগল কোনওটিতে মহাপ্রভু শচীমায়ের আঁচল ধরে আঙ্গিনায় ঘুরছেন, শ্রীবাসে স্ত্রী মালিনী তাকে কোলে নিতে হাত বাড়ায়ে আছেন,—নিমাই তার দিকে চেয়ে হাস্‌ছেন, অথচ মায়ের আচল ছাড়ছেন না। নবদ্বীপের নানা লীলা ছবি দশখানি হ'ল। তার পর উড়িষ্যার চিত্র,—কোনটিতে মহাপ্রভু বাসুদে সার্ব্বভৌমের সঙ্গে তর্ক কর্‌ছেন; কোনটিতে ষাটির মা তাকে খাওয়াচ্ছে কোনটিতে গোপীনাথ আচার্য্যের বাড়ীতে তাঁর অজ্ঞানাবস্থায় রাজা প্রতাপ রুদ্র এসে তাঁর পায় ধরে আছেন, কোনটিতে সনাতনকে তিনি বড় হা দাসের গোঁফায় জোর করে আলিঙ্গন দিচ্ছেন, সনাতন মিনতি ক' নিষেধ কচ্ছেন। কোন্‌টিতে রঘুনাথ দাস আস্‌ছেন, দূর হ'তে স্বর মহাপ্রভুকে দেখিয়ে দিচ্ছেন, কোনটিতে সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে মহাপ্রভুর পা প্রতাপরুদ্র দাঁড়িয়ে। তাঁকে ঠেলে ফেলে নরহরি অগ্রসর হচ্ছেন, দেখে :

এই মূর্ত্তিগুলির গোঁড়া-ভক্ত হ'ল সুহাসিনী—১০১ পৃঃ

হরি চন্দন তাঁকে বারণ কচ্ছেন—তখন নরহরি মন্ত্রীর গণ্ডে কষে চর মারছেন—উড়িষ্যা লীলার দশখানি। তার পরে দাক্ষিণাত্য—বারমুখী উদ্ধার, নারোজিকে ভক্তি প্রদান, বগুলা বনে ভীলপন্থের সাক্ষাৎ,—হতভাগিনী মুরারীদের মধ্যে প্রধানা ইন্দিরাকে ভক্তি প্রদান, রুদ্র-পতি মিলন, দ্বারকাধীশের মন্দিরে অপূর্ব্ব-বেশী সন্ন্যাসীর সহিত দেখা প্রভৃতি দশখানি। তার পর বৃন্দাবন ভ্রমণ, কাশীতে প্রবোধানন্দ স্বামীর সঙ্গে তর্ক, কৃষ্ণদাস নামক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা, যমুনার কালীয় হ্রদে জেলে নৌকাতে কালীয় ভ্রম করে এক ভক্ত প্রতারিত হচ্ছেন, মহাপ্রভু তথায় উপস্থিত হ'য়ে ভ্রম নিরাসন কচ্ছেন, কাশীতে বিপুল সঙ্কীর্ত্তন,—তার অজ্ঞানাবস্থা দেখে রাজপুত কৃষ্ণদাসের উপর বিজলী-খানের সন্দেহ, ইত্যাদি দশখানি।

ইহা ছাড়া মহাপ্রভুর পানিহাটী, বরাহনগর, এঁড়েদহ প্রভৃতি ভ্রমণের আর দশখানি। এই ৫০ সেট মূর্ত্তি রাতদিন পরিশ্রম ক'রে বিপিন তিন মাসের উর্দ্ধকালে নির্ম্মাণ করলে। মূর্ত্তিগুলি এমনই সুন্দর হ'ল, যে রাতদিন সেগুলি দেখ্‌বার জন্য রমেশবাবুর বাড়ীতে দস্তুর মত ভিড় হ'তে লাগল। কেউ কেউ টিকি ঝুলিয়ে গরুড় পক্ষীর মত হাত জোর ক'রে মূর্ত্তিগুলিকে দূর হ'তে প্রণাম করত, কেউ দেখে দেখে কেঁদে ফেলত, কেউ সেগুলি কিন্‌তে চাইত, সেই পঞ্চাশ সেট মূর্ত্তির এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত দাম উঠ্‌ল। •

এই মূর্ত্তিগুলির গোড়া ভক্ত হ'ল সুহাসিনী। সে ব'সে ব'সে সেগুলি দেখে আর তৃপ্ত হ'ত না। প্রত্যেকটি মূর্ত্তি কি অবস্থা বুঝুচ্ছে—তা যখন বিপিন উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলে যেত, তখন সুহাসিনী জ্ঞান হারা হ'য়ে শুনত। মূর্ত্তিগুলির বর্ণনাচ্ছলে বিপিন মহাপ্রভুর ছোট্ট একখানি জীবনী লিখে ফেল্ল—সেই বইএর সুরটি এমন করুণ যে যাঁরা তা শুনেছে, তা' ভুলতে পারে নি। সুহাসিনী তো বল্‌ত যে বিপিনদার বই চৈতন্য-

চরিতামৃতের থেকেও ভাল। বলা বাহুল্য, বিপিন সুহাসিনীকে চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি পুস্তকের তত্ত্ব ইতিপূর্ব্বেই অবহিত করেছিল।

রমেশবাবু বিপিনকে একদিন বল্লেন, "নবদ্বীপের হরিচরণ সা সেখানে মস্ত বড় বাড়ী করেছেন—তোমার মূর্ত্তিগুলি নিয়ে ঘর সাজাতে চান—এক হাজার টাকা দিতে চান, তুমি অনেক দিন তোমার মায়ের খোঁজ করনি, এই টাকাটা পেলে তিনি খুব খুসী হবেন।"

বিপিন বল্লে "এগুলি আমি বিক্রী করব না।"

রমাদেবী বল্লেন, "কিছুতেই তো বিপিন বাড়ীতে টাকা পাঠাচ্ছে না, আমার কাছেও তো ওর কতকগুলি টাকা জমা আছে। এ মূর্ত্তিগুলি প্রাণান্ত শ্রম করে তৈরী করেছে—এগুলি সুহাসিনী কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। মূর্ত্তিগুলি তো তার প্রাণ।"

রমেশ। "তা হ'লে ঐ এক হাজার টাকা দিয়ে আমরাই কেন এগুলি কিনে রাখি না! বাড়ীতেই থাক্‌বে, সুহাসিনী পাগলী না হয় পূজার ব্যবস্থা করবে। বিয়ে হ'লে এই সব যৌতুক পেয়ে নিশ্চয়ই তার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা খুসী হবেন। কি হে বিপিন কি বল?"

বিপিনের চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়্‌তে লাগল। রমা বল্লেন, "ছিঃ তুমি আমার বাছার মনে কষ্ট দিচ্ছ। সে তোমার কাছে মূর্ত্তি বিক্রী করে খাবে, তেমন ছেলেই আমার!" এই বলে তিনি তাকে হাতে ধরে "চল, ভাত হয়েছে, খাবে এখন, মূর্ত্তি দিয়ে কাউকে ঘর সাজাতে হ'বে না, এগুলি মন সাজাবার জিনিষ" বলে উঠিয়ে নিলেন। বিপিন বুঝ্‌লে—রমা ঠিক বুঝেছেন, রমেশ বাবুর কাছে সে মূর্ত্তি বিক্রী করতে যাবে?

রমেশবাবু বল্লেন, "বিপিন কিছু মনে ক'র না—আমি না বুঝে একটা কথা বলেছি।"

বিপিন বলে গেল "আপনার কাছে আমি ছেলের মত আছি, এমন কথা শুনলে কষ্ট হয়, যাতে মনে হয় আমি এ বাড়ার ছেলে নই।"

কিষণলাল বল্লেন, "মূর্ত্তিগুলি দিয়ে তুমি কি করবে, বলনা। এগুলি দেখবার জন্য দিনরাত তোমাদের বাড়ীতে ভিড় হচ্ছে।"

বিপিন। "যা করব ভাবছি, তা ভগবানের অভিপ্রেত হ'লে তো হ'বে। আমি তাঁর ইচ্ছার প্রতীক্ষা কচ্ছি।"

কিষণলাল। "তোমার হচ্ছা কি?"

বিপিন। "যদি নবদ্বীপে খানিকটা জমি পেতুম, তবে মন্দির করে এগুলি প্রতিষ্ঠা করতুম। সেখানে শত শত ভক্ত আসেন, তাঁদের যদি কারু এক ফোঁটা চোখের জলও এদের উদ্দেশ্যে পড়ত, তবে তার চাইতে কাঠ খড় ও তুলির কাজের বেশী দাম আর কি হ'তে পারত!

কিষণলাল। "আচ্ছা—তোমার যদি কেউ জায়গা ও মন্দির করে দেয়—তাতে কত লাগ্‌বে? ৫০,০০০৲?

বিপিন হেসে উঠে বল্লে—"অত টাকা দিয়ে কি হবে? অবশ্য মহাপ্রভুর মন্দিরের কাছে জমির দর বড্ড বেশী, একটু দূরে তেমন বেশী নয়, হাজার দুই টাকায় এক বিঘা জমি হ'তে পারে। দুই দিকে গ্যালারির মত করে আয়নার ফ্রেমে এঁটে এক এক সেট মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন ক'রে রাখা যেতে পারে। তাদের নীচে মূর্ত্তি পরিচয় লিখে রাখব। একখানি সুন্দর ছোট্ট রাধাকৃষ্ণের মন্দির বেশ পছন্দসই ক'রে তৈরী হবে, তাতে যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। দেখুন বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা আছে, ভক্ত অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁরা চোখের জলকে প্রাধান্য দিয়ে চরিত্র সম্বন্ধে অসাবধান। মহাপ্রভুর নামে তারা উন্মত্ত হন, কিন্তু তাঁর জীবন ও ধর্ম্ম মতের তারা কোনও খোঁজেই রাখেন না। নবদ্বীপে যা দেখলুম, তাতে ভণ্ড বাবাজীদের অভাব নাই। মহাপ্রভুর নির্ম্মল ধর্ম্ম বুঝিয়ে দিয়ে চরিত্র শুদ্ধি ও ভক্তির

যাতে সমন্বয় হয়, এরূপ পুস্তিকা লিখে লিখে প্রচার করলে বোধ হয় ভাল কাজ হয়। আমার মূর্ত্তিগুলি তো আছেই, তাদের জন্য তো কোন টাকা লাগ্‌বে না আর বোধ হয় হাজার ছয়েক টাকায় সব কুলোতে পারবো। ধরুন জমি এক বিঘা ২০০০৲ টাকা। রাধাকৃষ্ণ মন্দির ও বিগ্রহ ১৫০০৲। দুই দিকে গ্যালারী, এক এক দিকে ২৫ সেট মূর্ত্তি ২০০০, একটা গেট ২০০ টাকা; কীর্ত্তন, মহোৎসব, দর্শকদিগের স্থান কাঠা দশেক নিয়ে হবে। তার চার দিকে চারটী থাম, উপরে চাঁদোয়া খাটাবার ব্যবস্থা ১০০০৲ টাকা। পূজারী চাকরের থাক্‌বার স্থান—রান্নাঘর ইত্যাদি (খড়ো ঘর) ৩০০৲ টাকা। আমার বোধ হয় মোটামুটি হাজার ছয়েক টাকায় এ হ'তে পারে। এই বিগ্রহ-দর্শনী একটা নিতে হ'বে, ধরুন ১/০ আনা কি।০ আনা। অবশ্য যারা গরীব, অসমর্থ, তাদের পয়সাটা মন্দির হ'তেই দেওয়া হবে। নিত্যকার আয়ের থেকে পূজারী চাকর, ও ভোগের ব্যয়টা চলে যাবে, আর পার্ব্বণের টাকাটা একটা বেশ আয় দাঁড়াতে পারে—তা হ'তে ছাপাখানা করে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার হ'তে পার্‌বে।

কিষণলাল—"দয়া করে, তুমি যদি গ্রহণ কর, আমি তোমাকে বাপের মতন স্নেহ করি,—যদি দয়া ক'রে গ্রহণ কর, তবে হাজার দশেক টাকা আমি দিতে পারি—বল্‌তে বল্‌তে কিষণলালের চোখে জল এল। তিনি সস্নেহে বিপিনের হাত দুটো ধরে বল্লেন—তুমি ভগবানের ইচ্ছার প্রতীক্ষা কচ্ছ, আমাকে উপলক্ষ ক'রে ভগবান তোমার এই টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আমি তাঁর মুটে হ'য়ে তোমার টাকা নিয়ে এসেছি—অগ্রাহ্য কো'র না। বাবা, না নিলে বড় কষ্ট হবে।"

বিপিন। "আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, শুধু মোটা চাল ও মোটা কাপড় যা দিয়ে আমাদের সমস্ত অভাব দূর হয়, আর সব বাহুল্য মাত্র, সেই মোটা কাপড় ও মোটা চালের দান ভিন্ন আমি কোন ভিক্ষা গ্রহণ কর্‌ব না।

আপনি এমন করে বলেছেন, আমি কি ক'রে অস্বীকার করি? তবে যদি আপনি আমায় হাজার ছয়েক টাকা ধার দেন, তবে আশা করি আমি ধার শোধ করতে পারব। কিন্তু যদি আমি ধার শোধ না করতে পারি—এই দ্বিধায় হাত উঠ্‌ছে না। একটি কথা, আমার পিতা মহাকর্ম্মী, তিনি চাকুরী ছেড়ে স্বাবলম্বনের পথে গেছেন। আমার বিশ্বাস, তাঁর মত জেদী লোক কার্য্যক্ষেত্রে নেমেচেন, তিনি হয়ত প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করবেন। ধার শোধের পূর্ব্বে যদি আমার মৃত্যু হয়—তবে আপনি প্রতিশ্রুত হন, যে বাবার কাছে আপনি আমার এই ঋণের কথা জানাবেন, তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রের ঋণ যেরূপে পারেন শোধ দেবেন।"

কিষণলালকে অগত্যা তাই স্বীকার করতে হ'ল, কিন্তু তিনি কোন সুদ নেবেন না—ইহা বিপিনকে কবুল করতে হ'ল।

কিষণলাল জীবনে সাফল্য লাভ করেছিলেন, অর্থ কি ক'রে অর্জ্জন করতে হয়—তা তিনি জানতেন। তিনি ঠিক বুঝেছিলেন যদিও বালকের উদ্দেশ্য সাধু—একান্ত স্বার্থশূন্য—কিন্তু এই উপায়ে তার প্রচুর উপার্জ্জন হবে। নবদ্বীপ ক্রমশঃ গড়ে উঠছে। এক ধুলটের সময় ৫০০০০ লোক তথায় জড় হয়। তার পর প্রতি পার্ব্বণেই লোকের আমদানী। দোল, ঝুলন, রাস, রাধাষ্টমী প্রভৃতি প্রতি পার্ব্বণেই লোকের ভিড়, কোনটিতে ২০০০০ কোনটিতে ১০০০০, এইরূপ। বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার দূর দূরান্তর হতে যাত্রী আসে। মনিপুর, শ্রীহট্ট, কাছাড়, ত্রিপুরা, নোয়াখালী চাঁটগা, কতদিক থেকে যে যাত্রী নবদ্বীপে আসে তার ইয়ত্তা নাই। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম যে বাঙ্গলার প্রাণের ভিতর কতটা জায়গা অধিকার করেছে, নবদ্বীপের পার্ব্বণোপলক্ষে তা বোঝা যায়।

এই সকল যাত্রীর অনেকেই নবদ্বীপের মহাপ্রভুর সমস্ত লীলা দেখে যাবে সঙ্কল্প ক'রে আসে। কত দরিদ্র বহুকষ্টে পঞ্চাশ ষাট টাকা আজীবনের

চেষ্টায় সংগ্রহ ক'রে—তা নবদ্বীপে খরচ করে যাবে, এই উদ্দেশ্যে আসে, সে টাকা বাড়ী ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে না। বিপিনের মূর্ত্তি গুলি এত সুন্দর হয়েছে, তার মুখের কথা এত মিষ্ট ও হৃদয়ে এত ভক্তি—যে তার মন্দিরে বহু লোক আস্‌বার সম্ভাবনা। শীঘ্রই তার একটা নাম পড়ে যাবে। নবদ্বীপে কেউ এসে আর তার মূর্ত্তিগুলি না দেখে যাবে না। ধুলটের সময় ৫০০০০ লোকের মধ্যে যদি ২০০০০ লোক অন্ততঃ পক্ষে তার কুঞ্জে আসে, তবে ।০ আনা হারে দর্শনীও নিলে সেই সময়েই তার ৫০০০৲ টাকা উপার্জ্জন হবে। বৎসর ভরিয়া তার আয় দশ হাজার টাকার উপরে হ'তে পারে। এ আয়ের কোন লোকসান নাই। জমির দরও ক্রমশঃ বাড়ছে, মূর্ত্তিগুলিরও একটা দর আছে, যা কোটা বাড়ী তৈরী হয়েছে তারও তো মূল্য আছে। সুতরাং এই আয় লোকসানের আশঙ্কা বর্জ্জিত নিশ্চিত আয়। ক্রমশঃ খ্যাতি বৃদ্ধির সঙ্গে এই আয় বাড়বে বই কম্‌বে না।

যদি কোন উৎসবে অনুপস্থিতি নিবন্ধন, পূজারী বা চাকর এই টাকা চুরি করে, তবে তো মাত্র একটি বার ক্ষতি হবে। বরাবর তো কোন লোকসানের আশঙ্কা নাই। কিষণলাল টাকার দিক্ দিয়া এই মন্দির-প্রতিষ্ঠার মূল্যটা বুঝে নিলেন। যে সকল কারণে গয়ালীরা ও পুরীর পাণ্ডারা এত বড়লোক হয়েছে, যে কারণে মঠের মহান্তদের অগাধ সম্পত্তি হয়েছে, এ ঠিক সেই রাস্তা। ভারতবর্ষের লোকেরা এই দিক্‌টাই বোঝে, কিষণলাল সেদিন মণিপুরীয়াদের যে উচ্ছ্বসিত ভক্তির আবেগ নিজের চোখে দেখেছেন, তাতে বুঝেছেন বঙ্গদেশের মর্ম্ম কোথায়? ভারতবর্ষের যত তীর্থ গড়ে উঠেছে এই ধর্ম্ম-প্রাণতার ভিত্তির উপর; ব্যবসায়ীর পক্ষে এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু ব্যবসায়ীর হৃদয় তো শুষ্ক নীরস; এই ছেলেটির ভিতর যে ভক্তির বন্যা প্রবাহিত হচ্ছে—তাতে লোক ভেসে যাবে, অসংখ্য অর্থ এই উপায়ে অর্জ্জিত হবে। পুত্র

পৌত্রাদিক্রমে বিপিনের বংশ তা' ভোগ করতে পারবে। যদিও সে অর্থ চায় না, সে না চেয়ে কুবেরের ভাণ্ডারের দিকে এসেছে।

কিষণলাল বুঝলেন, বাঙ্গলায় চৈতন্য জন্মেছেন, রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, আরও কত সাধু মহাজন জন্মেছেন। জনসাধারণ এদেরই চায়। এই তীর্থের মালিক অপর লোকেরা হয়ে যাচ্ছে। বাঙ্গালী যুবক সাহেব কোম্পানীর দোর-গোড়ায় আর্জ্জি হাতে বসে কাঁদছে—হারে হতভাগা! তোর বাড়ীর ঠাকুরের পায়ে গিয়ে পড়, তুই টাকার উপর শুয়ে থাকতে পারবি।

কিষণলাল যা ভাবছিলেন,—ঠিক তাই হ'ল। এক বছরে নবদ্বীপে "যোগেশ কুঞ্জের" আয় দাঁড়াল ১০০০০্ টাকা। চারিদিকে প্রচার হয়ে গেল, ঠাকুরের মূর্ত্তিমান রূপ ধরে নদেতে এক দেবশিশুর আবির্ভাব হয়েছে, তার কথা শুনে প্রাণ গ'লে যায়।

সেই এক বৎসরের মধ্যে রমা আর সুহাসিনী যে কতবার যোগেশ-কুঞ্জে এলেন, তা বলা যায় না। সুহাসিনী তো নদের সেই বিপিনদার বাপের নামে যে কুঞ্জ হয়েছে, তথায় গেলে কৃষ্ণনগরে ফিরতে চায় না। সে যে কয়েকদিন থাকে সে কয়েকদিন উৎসবে রাতে কারু চোখে ঘুম হয় না। সে যে কি আনন্দধাম হয়ে দাঁড়াল তা আর কি বলব! কিন্তু বিপিন অতি দুঃখের সঙ্গে বুঝতে পারলে, অশিক্ষিত লোকেরা তাকে ঠাকুর ক'রে গড়তে চাচ্ছে। এজন্য সে নির্ম্মল বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করতে কৃতসঙ্কল্প হ'ল। সে কিষণলালের দেওয়া সাত হাজার টাকা ফিরিয়ে দিয়েছে। কিষণলাল তা নিতে কোন আপত্তি করেন নাই। কিন্তু হপ্তাখানিক পরে বুড়ো জহরতের মুকুট, বালা ও হার নিয়ে শুধু পায় একদিন যোগেশ কুঞ্জে এসে পূজারীকে দিয়ে রাধাকৃষ্ণের অঙ্গাভরণ পরিয়ে দিয়ে গেলেন। বিপিন তাঁকে মানা করতে পারল না। এইবার তার মাকে চিঠি লিখবার সময় উপস্থিত হয়েছে, আজ দুই বছর সে মাতৃকোল-ছাড়া।

হ্যারিসন রোডের একটি মেসের ঘরে একটি ভদ্রলোক ব'সে তামাক খাচ্ছেন, এমন সময় একটি বুড় ভদ্রলোক এসে তাঁকে বল্লেন "হৃদয়বাবু এই ঘরে থাকেন ?"

উত্তর "তাঁকে দিয়ে আপনার কি দরকার ?"

তামাকের লোভ পেয়ে বৃদ্ধটি এসে ভদ্রলোকের পাশে বসলেন এবং বল্লেন, "হৃদয়বাবু হচ্ছেন প্রেসিডেন্সী কলেজের দ্বিতীয় কেরাণী রামলাল বাবুর নিকট আত্মীয়, মহাশয়! আমার ছেলেটি ম্যাট্রিক পাশ করেছে, তাকে আই, এস, সি ক্লাসে ভর্ত্তি করতে চাই, হৃদয়বাবু যদি একটু সাহায্য করেন।"

"আপনার ছেলে কোন বিভাগে পাশ হয়েছে ?"

"ম'শায় অল্প কয়েক নম্বরের জন্য প্রথম বিভাগে পাশ কর্ত্তে পারে নি।"

"তাহ'লে কি প্রিন্সিপাল তাকে নেবেন ? শুনেছি অনেক ফার্ষ্ট ডিভিসনের ছেলে তিনি নেন নি।"

"জোগাড় করলে সবই হয়, দ্বিতীয় বিভাগের দুই একটি না নিয়েছেন, এমন নয়।"

"আমি এই মেসে ব'সে যা শুনছি তাতে ৭০।৭১টি প্রথম বিভাগে পাশ ছেলে প্রেসিডেন্সীর আই, এস, সি ক্লাশে ঢুকতে পারে নি, ফললাভ করা খুব শক্ত, আপনার অবস্থা কিরূপ ?"

"মশ'য়, তা শোচনীয়, আমি ২৫৲টি টাকা পেন্সন পাই, আর কোন আর্থিক আয় নাই, আরো দুটি ছেলে আছে তারা ছোট। একটি মেয়ে ১৪ বছরের, তার বে দিতে হ'বে। আমার সহধর্ম্মিণী আছেন, বাড়ী

হাওড়া জেলায় বীরপুর গ্রামে, ৭।৮ বিঘে জমি আছে, তা ভাগে দিয়ে বছরের অর্দ্ধেকের চাল পাওয়া যায়।"

"আপনার ছেলের পড়ার ব্যয় চালাবেন কি ক'রে? প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াতে তো অন্তত ৪০।৪২ টাকা মাস খরচ লাগবে?"

"এক বিঘা জমির বিক্রীর ব্যবস্থা করেছি, তাতে ২৫০ টাকা পাব। আর ঝাকড়দা মাকড়দার রায় চৌধুরীদের বাড়ী থেকে ছেলের একটা সম্বন্ধ এসেছে, তাতে তাঁরাই পড়ার খরচটা চালাতে পারেন।"

ভদ্রলোক। "তাঁদের অবস্থা কি রকম?"

বৃদ্ধ। "অবস্থা আর কি? আজকালকার ভদ্রলোকদের অবস্থা তা তো জানেন। রায় চৌধুরীরা বনেদি কায়স্থ ঘর, এখন অবস্থা শোচনীয়। ধারে কর্জ্জে সংসার চলেছে। বাড়ীর দেবতারা আলোচাল-কলাটা পর্য্যন্ত পান না।"

ভদ্রলোক। "এরা আপনার ছেলের পড়ার ব্যয় চালাবেন কিরূপে?"

বৃদ্ধ। "ধারকর্জ্জ করে। বোঝার উপর শাকের আটি!" এই বলে দন্ত-হীন মাড়ি বের করে, একবার হাসি ও রসিকতা দেখাতে চেষ্টা পেলেন। তার পর "দিন ম'শয়, আপনি যথেষ্ট টেনেছেন" বলে কল্কেটা টেনে নিয়ে "কায়স্থের হুকা আছে?" এই বলাতে ভদ্রলোকটি দেয়ালের কোণে ঠেস দেওয়া আর একটি হুকা দেখিয়ে দিলেন, মাকড়সা তার মধ্যে সবে জাল বুনিতে সুরু করেছিল। সেইটি ঝেড়ে পুছে হাতে নিয়ে, কল্কেতে দুইবার ফু দিয়ে টান্‌তে সুরু করে দিলেন।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা মশ'য় আই, এস, সি পাশ করে আপনার ছেলে কি করবে?"

বৃদ্ধ। "কি আর করবে? এই তো আমার শ্যালীর পুত্র রঙ্গলাল বি, এস, সি, পাশ করে দুটি বছর ব'সে আছে। মাঝে আরমি ও মুভিতে ১৫৲

টাকার একটা কাজ পেয়েছিল, খামের উপর এ্যাড্রেস লিখতে হ'ত; তাও একটিনি, দুই মাসের জন্য; এখন আবার ব'সে আছে।"

ভদ্রলোকটি। "তবে আপনার ছেলের পেছনে মাসিক ৪০।৪৫ টাকা খরচ করে আরো ৪।৫ বছর পড়িয়ে কি হবে? তার পর বি, এ সি, পাশ করে তো তার দুই বছর ব'সে থাকতে হবে! সেই ব'সে থাকার পর দৈবক্রমে সে দুই মাসের জন্য ১৫ টাকা মাহিনার খাম লিখবার একটিনি কাজ পেতে পারে। দিনকাল তখন আরও ঘোরাল হবে,—হয়ত, ঐরূপ কাজও না পেতে পারে। তার চাইতে ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের ভিটে বন্ধক দিয়ে কর্জ্জ করা টাকার থেকে যদি ৪০।৪৫ টাকা বের করতে পারেন, তবে সে টাকাটা দিয়ে ৪।৫ বছর তো সংসারের উপকার হ'তে পারবে।"

বৃদ্ধ। "আপনি কি বলতে চান ছেলেটার লেখাপড়া বন্ধ করে দেব? হীরার টুকরা ছেলে, কোন ক্লাসে প্রমোসন না পেয়ে থাকে নি, ওকে পড়াব না?"

ভদ্র। "তবে পড়িয়ে দেখুন, হীরার টুকরা ভেঙ্গে কাণা কড়ি ক'রবার চেষ্টা করুন।"

বৃদ্ধ। "না পড়িয়ে কি করব?"

ভদ্র। "এই যে শত শত হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী পাঞ্জাবী আসছে, তারা কি কচ্ছে।"

বৃদ্ধ। "ওদের কথা ছেড়ে দিন, বাঙ্গালীর ছেলে কি তাই পারবে। সারাদিন রাস্তায় চেঁচিয়ে দুই পয়সার আলপিন বিক্রী করতে পারবে?"

ভদ্র। "ঐ ছেলেগুলি, কারু বয়স ১০, কারু বয়স আরও কম—৭।৮, ওরা দৈনিক ১৲ টাকার নীচে উপার্জ্জন করে না। ছাতির রিং ও চিমনি বড় বাজার থেকে এক আনা হিসাবে কিনে এনে ৴১০ বিক্রী

করে—তাতে রোজ ১৲ টাকা ১।০ হয়। এই ৮।১০ বৎসরের ছেলে সুরু থেকে মাস ৩০।৩৫ টাকা উপায় করে, তার পর যখন বিশ পঁচিশ বছর বয়স হয়—তখন এরা এক একজন পাকা ব্যবসাদার হয়। এই দশ বার বছর পরিশ্রম করে—এরা কারবারটি এমন ক'রে শিখে, যাতে ক'রে যখন এদের বয়স ত্রিশ, বত্রিশ হয়—তখন এরা বড়বাজারে পাকা এমারত তোলে। আর অতি সামান্য খায়, পরণ অতি সামান্য—শুধু পা, শুধু গা। এই বিশ পঁচিশ বছরে এত ব্যয় করে আপনার ছেলে পড়া শুনা শেষ করে যা' দাঁড়াবে, তাতে সে একেবারে অকর্ম্মণ্য—বিলাসী একটা অপূর্ব্ব জীব হবে। রোদে তার মাথা ফাট্‌বে—পাঁচ টাকার ছাতায় তাকে রক্ষা করতে পারবে না। বৃষ্টির আঁচ লাগলে তার সর্দ্দি হ'বে—সে কেবলই কাস্‌বে, ১৮।১৯ টাকার ওয়াটার প্রুফ্ না হ'লে তা'র বর্ষাকালে বিষম মনস্তাপ ও অসুবিধা হবে। এত ক'রে সে কিছুই রোজগার করতে পারবে না—তার পর শ্বশুর বাড়ীর সর্ব্বস্বান্ত করে যা আনবেন, তার শোধ শ্বশুর-কন্যা নেবেন। তার আতুর ঘর কামাই পড়বে না। মা ষষ্ঠির কৃপায় ৫।৬ বছরের মধ্যে ঘর ভর্ত্তি হয়ে যাবে—তখন কলাটা মূলাটা খেতে পাবে না।"

বৃদ্ধ। "এ সকল তো সব্বাই জানে, তবু ছেলেকে কি না পড়ালে হয়? লোকেই বা বল্‌বে কি?"

এমন সময় কলরব ও তর্কবিতর্ক করতে শুভেশ, সন্তোষ এবং হৃদয়বাবু তথায় উপস্থিত হলেন। হৃদয়বাবু বৃদ্ধকে প্রণাম করে বল্লেন, "শাস্তির প্রেসিডেন্সীতে ঢুকবার কোন জোগাড় হ'ল না। আমি আমার আত্মীয় রাম-লাল বাবুকে বলেছিলেম, তিনি বল্লেন রিমোটেষ্ট চান্স্ (সুদূরতম সম্ভাবনা) ও নেই। যাঁরা প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপনের জন্য টাকা দিয়াছিলেন, তাদেরও কারু কারু কথা রক্ষিত হয় নি, তবু তো যে সকল ছেলে প্রথম শ্রেণীতে

পাশ করা। আজ বারণ কোম্পানির বড় সাহেব নিজে এসে একটি ছেলের জন্য সুপারিশ করেছিলেন, তাকেও নেওয়া হয় নি। বাঙ্গালীর সুপারিসের আর মূল্য কি? আপনি আই, এ, ক্লাসে দিতে চেষ্টা করুন, তাও প্রেসিডেন্সিতে হবে না, সেণ্ট্রাল কলেজে হয়ত নিতে পারে।"

বৃদ্ধ তিলার্দ্ধ দেরি না করে একটা ভাঙ্গা ছাতা ও লাঠি নিয়ে উঠে মেস ছেড়ে চলে গেলেন।

হৃদয়বাবু সন্তোষকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার চাকুরীর কি হ'ল?"

সন্তোষ। "তা আর কি বল্‌ব? এই দুই মাস হাটিয়ে টিম্বার কোম্পানির বড়বাবু বিজয় বাবু বল্লেন, "এই দেখুন ৭৮৯ খানি আরজি এসেছে, আপনি শুধু বি, এ। ত্রিশ খানি এম, এ পাশের দরখাস্ত পড়েছে, তা ছাড়া বি, এ অনার্সের লেখাজোখা নেই, বেতন তো ২২৲ টাকা। ভাই, যদি আগে ভরসা না দিতেন, তবে আমার জুতা জোড়ার নূতন তালিটা ছিঁড়্‌ত না; পেরেক মেরে তালিটা দিতে ⁄১০ আনার পয়সা লেগেছে; তা এই এক হপ্তা' দুইক্রোশ হেঁটে পাঁচ বার তাঁর বাড়ীতে আনাগোনা করতে একবারে খ'সে গেছে। আর তো তালি দেওয়ার পয়সা নাই, এখন রাঁস্তায় বার হই কি ক'রে। এদিকে সাজো ধোপার বাড়ীতে একখানি কাপড়, একটি চাদর দিয়েছি। দুটি পয়সা হাতে নেই যাতে করে তা' আন্‌তে পারি। মেসের তিন মাসের বাকী পড়েছে। এদিকে বাবা বাড়ী থেকে ক্রমাগত টাকার জন্য চিঠি লিখ্‌ছেন, মায়ের হাফানি বেড়ে গেছে, ডাক্তার বলেছে একটু দুধ খেতে না দিলে এবারকার ফিট সারভাইভ্‌ করতে পারবেনা, বাবা তো ডিস্‌পেপসিয়ায় অকর্ম্মণ্য। ছোট ভাই দুটি যে কি খাচ্ছে ভগবানই জানেন, রতনসাহার কাছে বাড়ীটি বন্ধক পড়েছে, নীরুর বের সময়। এদিকে স্ত্রী লিখ্‌ছেন, তার বাপের বাড়ীর অবস্থা ভাল নয়—তাকে নিয়ে আস্‌তে। কি যে করি?

হৃদয় বাবু সহানুভূতির ভাবে বল্লেন, "আমি দেখি তোমার কোন কাজ কর্ম্মের কিছু করতে পারি কি না। আমারও তো ভাই ৮০৲ টাকা মাইনা। এম, এস, সি প্রথম শ্রেণীতে পাশ করে ডিমনেষ্ট্রটারী কচ্ছি,—উন্নতির কোন আশাই নেই, পাঁচ বৎসর এক মাহিনায় আছি। দাদা মারা যাওয়াতে তাঁর তিনটি সন্তান শুদ্ধ বিধবা স্ত্রীর ভার তো আমার উপর পড়েছে, তার উপর আমার নিজের সংসারটি কম দাঁড়ায় নি। তোমাকে ভাই আমি দশটি টাকা দিচ্ছি। গোটা পাঁচেক টাকা মাকে পাঠিয়ে দাও, আর গোটা পাঁচেক এখানকার খরচের জন্য রাখ। আমি মেস সুপারিণ্টেণ্ডকে ব'লে আরও কয়েকদিন ঠেকিয়ে রাখব। মেসের টাকা তোমার এখন চুকিয়ে দেওয়া অসম্ভব।"

সেই দশ টাকার নোটখানা হাতে কর্ত্তে গিয়া সন্তোষের চোখের জল টপ্ টপ্ করে পড়তে লাগল। সে বল্লে, "তুমি আমার সহাধ্যায়ী, কিন্তু আজ তুমি ভাইএর চাইতেও আমার বেশী উপকার কর্‌লে। আমি আত্মহত্যা করবার সঙ্কল্প কচ্ছিলুম।"

সেই ভদ্রলোকটিরও চোখে জল এসেছিল। তিনি সেখানে আর ক্ষণকাল না থেকে বাহিরের বারাণ্ডায় নির্জ্জনে এসে দাঁড়ালেন।

তখন সন্ধ্যাকাশে নক্ষত্রগুলি জ্বল্‌তেছিল এবং শীতল হাওয়া গায়ে বুলিয়ে যেন ভগবান তাঁর কর্ম্মক্লান্ত জীবগুলির শ্রম অপনোদন কচ্ছিলেন। ভদ্রলোকটি একা দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে লাগলেন এবং বল্লেন, "হা ভগবান এই দেশময় দুর্দ্দশা! সেই বৃদ্ধটি হচ্ছে বাঙ্গালী ভদ্রলোকের যথার্থ পরিচয়। উনি একা নহেন, ঘরে ঘরে ঐ মূর্ত্তি, সন্তানের ভাবনা ভেবে দিশেহারা হয়ে—দায়গ্রস্ত ভদ্রলোকেরা এইরূপ ক'রে বেড়াচ্ছেন। আর এই সন্তোষ একক নহে—শত সহস্র। এই ঘোর দুর্দ্দশার থেকে কি ক'রে দেশকে উদ্ধার করা যায়? আমরা তো মরতে বসেছি। আমাদের আম কাঁটালের

বাগানের ছায়ায় শান্তির ঘরে যে আগুন লেগেছে, শত শত বৃদ্ধ শত শত যুবক যে আসন্ন মৃত্যু—আর মেয়েদের যে কি দুর্দ্দশা, তা অবর্ণনীয়। তাঁরা তো বাহির হ'তে পারেন না, ঘরে ঘরে শুকিয়ে মচ্ছেন, উপবাস ও রোগজীর্ণ কঙ্কাল হয়ে চিরতরে শয্যা ছেড়ে শ্মশানে স্থান নিচ্ছেন।

হায়, এই দশা কি বসে বসে চোখে দেখ্‌ব, সন্তোষ আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন, শত শত যুবক তাই করতে চাচ্ছেন। কেউ এনার্কিষ্ট হচ্ছেন, কেউ হুজুগে পড়ে জেলে যাচ্ছেন—অর্থাভাবে লোকে ছন্নমতি হয়—পাগল হয়, হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়।

আমি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দুঃখ, এই অবধিশূন্য ক্লেশ—অনশন, ব্যাধি, অশান্তি চেয়ে দেখব? আমি কি আমার ভাইদের কাছে দায়ী নই? অপর জাতিরা হলে একত্র হ'য়ে কি না করত? মৃত্যুর এই ভীষণ দৃশ্য দেখে দেখে আমাদের চোখ সয়ে গেছে, আমাদের আত্মা বাত-ব্যাধিগ্রস্ত, পরের দুঃখ নিজের দুঃখবোধ লুপ্ত হয়েছে।

আমি তো চাল ডালের কারবার করে টাকা কচ্ছি। বাথরগঞ্জ ও ভোলা, ঝালোকাটি প্রভৃতি অঞ্চলে নিজে ঘুরে ঘুরে দাদন দিয়ে যে চাল আমদানি করেছি, তা বেচে বৎসরান্তে প্রায় ১৪০০০৲ টাকা হবে। এই কাজ চালাতে পারলে আর পাঁচ বছরের মধ্যে আমি একজন ধনী মহাজন হব; কলা, কচু, আনারস থেকে সুরু করে এই দাঁড়িয়েছে। রহমান মোল্লার কাছে ব্যবসার ফাঁক জেনে আমার অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমি অর্থশালী হ'লে কি হবে? একার অর্থে কি লাভ, এক পুরুষে রোজগার করে অপর পুরুষে লুটিয়ে দেয়। এই যে সোণার চাঁদ ছেলেরা না খেয়ে মরছে, এই যে জীবনের মহামূল্যবান অংশ এরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেটে শেষে অসার হ'য়ে প'ড়ছে, শেষে ১৫।২০ টাকা মাহিনার কেরাণী-গিরিতে চেয়ারে শুয়ে কাজ করবার সুবিধা খুজছে, এতে যে ধনে প্রাণে

সপরিবারে মরতে বসেছে। আমি কি দাঁড়িয়ে তাই দেখব! নিজের ভাই জলে ডুবে মরছে, আর আমি কুয়োর পারে দাঁড়িয়ে জড়পদার্থের মত নিশ্চেষ্ট আছি। হে ভগবান আমি নিজে ধনী হ'তে চাই না, আমার দেশকে—আমার সুজলা সুফলা মাতৃভূমিকে দারিদ্র্য রাক্ষসীর কবল হ'তে কি ক'রে বাঁচাব, তাই বলে দাও।" নত মস্তকে তিনি তাঁর আদেশ শুনতে প্রতীক্ষা ক'রে দাঁড়ালেন। একবার বহুদিন পূর্ব্বে তিনি এইভাবে তাঁর আদেশের প্রতীক্ষা করেছিলেন—তখন তাহা পেয়েছিলেন। আজ দাঁড়িয়ে বল্লেন, "আমার এ দেহ টুক্‌রা টুক্‌রা করে কেটে তপস্যা করব, আমার জাতিকে রক্ষা কর ভগবান, আমাদের এমন সাধের গ্রামগুলি—পিতৃ-পিতামহ পদচারণ পুণ্য—জননীর বিগলিত অশ্রুধারা, আনন্দ ও বাৎসল্য-রস পুষ্ট বাঙ্গালার প্রিয় গ্রামগুলিকে রক্ষা কর, আমাদের আরতির ঘণ্টা আবার বেজে উঠুক, আমাদের পল্লীবাসীদের—হৃদয় আবার উদার কর, তারা যেন শত শত হৃদয় নিয়ে ব্যথিতের ব্যথা বুঝতে পারেন, শত শত হস্ত দিয়ে পরের অভাব মোচন করতে পারেন; পল্লীর লোকেরা যেমন আগেকার দিনে করতেন। "'মা' 'মা' বলে ভদ্রলোকটি কাঁদতে লাগলেন, "মা, আমার ভাইদের বাঁচাও, আমার প্রাণ নিয়ে তাঁদেরে বাঁচাও, আমার চৌদ্দ হাজার টাকার মূলধন আমি কাণা কড়ির মত ফেলে দেব—আমি কিছু চাই না, আমার দেশের শত শত পল্লীমায়েদের অন্ন বস্ত্রের কষ্ট মোচন কর, আমি তাদের কষ্টের কথা ভাবতে পারি না।"

সান্ধ্য গগনে বায়ু আবার দুলতে দুলতে ব'য়ে গেল। ভদ্রলোকটি স্পষ্ট শুনলেন, কেউ বলছেন "পারবি পারবি।" নক্ষত্রগুলি আশ্বাস দেওয়ার হাসি হেসে বল্লে—"তোর যখন মনন হয়েছে, তখন পারবি।" উদার আকাশ যেন তাকে বুকে করে বলে উঠলে, "তোর সঙ্কল্প শুভ, ব্যর্থ হবে না।"

ভদ্রলোকটি আবার যেন নবজীবন পেলেন। ঐরাবতের মত একটা

প্রকাণ্ড শক্তিতে তার অস্থি পাঞ্জর যেন বলিষ্ঠ হয়ে উঠল, কে যেন বল্লে—"দেহটা আত্মার বাহন, কে বলে তুই একা—তোর মধ্যে শুভ ইচ্ছা জেগেছে—তোর পশ্চাতে সহস্র সহস্র বাহু।"

১৫

রহমন মোল্লা বল্লে "বাবু, কারবারটা বেশ ফেঁপে উঠেছে—এটা কেন ছেড়ে দেবেন।"

ভদ্রলোক "আমার কারবার ভাল লাগ্‌ছে না, আমার আরেক জায়গা থেকে ডাক্ পড়েছে। তুমি তো তা হ'লে আমার কারবারটি ১২০০০৲ টাকায় নিলে ?"

রহমত "এ টাকা যে আপনি দেবেন, আমার মনে ছিল না, অবশ্য বছর ঘুরতে হাজার চৌদ্দ টাকা পাওয়া যাবে তাতে ভুল নাই। কিন্তু আপনি এই কারবার ক'রে যে সুনাম অর্জ্জন করেছেন, সে সুনামের তো একটা দাম আছে, তা বড় কম নয়। দাদনের ট কা দিয়ে যদি কেউ ফাঁকি দিয়েছে, তার নামে সাধ্যপক্ষে আপনি নালিস করেন নাই। তার বাড়ীতে গিয়ে ছেলে মেয়েকে বুঝিয়েছেন, তার স্ত্রীকে বুঝিয়েছেন, আপনার ব্যবহারে খোদার নাম নিয়ে তারা শপথ করেছে। যে টাকা ভেঙ্গে খেয়েছে, তাকে আরও কিছু দিয়ে নিজে চোখের সামনে খাটিয়াছেন, সে পুনরায় ফাঁকি দিতে চাইলে তার স্ত্রী পুত্র তাকে ছাড়ে নেই, "এমন বাবুকে ফাঁকি দিলে ধর্ম্মে সইবে না" ব'লে তারা জোর করে ফসল আদায় করে দিয়েছে। চাষাদের ঘরে ঘরে ব্যারামের সময় বিনামূল্যে ঔষধ জুগিয়েছেন, তারা ত আপনাকে দেবতার মত মনে কচ্ছে। আপনার সময়টা খুবই ভাল। চাইকি পাঁচ বছর পরে এই কারবারে আপনার চার পাঁচ লাখ টাকা হ'তেও আশ্চর্য্য নাই। অপর কেউ হ'লে আমি সন্দেহ করতুম, এই কারবার বিক্রীর মধ্যে

হয়ত কোন চা'ন্স আছে নতুবা এমন ব্যাকুবী কেউ করে ? কর্ত্তা আমায় ক্ষমা করবেন। বাবু তো লেহা পড়ায়ও পণ্ডিত, পাটের সাহেব তো সেদিন এসে আপনার সঙ্গে ইংরেজী কথায় এঁটে উঠ্‌তে পার্‌লে না। আমরা লেখা পড়া না জানলেও তো ধরণ-ধারণে সব্‌ বুঝি, আপনি একজন লায়েক লোক। কর্ত্তা যখন মুখ দিয়ে কথা বের কয়েছেন, তাতে খেলাপ হবে না, তা জানি। তবে আমি চল্লাম, টাকাটা এনে একটা লেখা পড়া শেষ করে ফেলি।"

এমন সময় একজন প্রৌঢ় সুদর্শন, গোঁফ-দাড়ী কামানো লোক এসে ভদ্রলোকটিকে নমস্কার কর্‌লেন। তাঁকে দেখে ভদ্রলোকটি বল্লেন, "এস, কেদার খবর কি ?

"কারবারটা কি সত্য সত্যই তুলে দিলেন, এটা রেখেও তো আমাদের আদর্শ পল্লীর কাজ চলতে পারত!"

"না, কেদার, তা হ'লে আমি পূরো মনোযোগ দিতে পারতুম না।"

কেদার। "এই কারবারটা মস্ত বড় হয়ে উঠলে তো অনেক বাঙ্গালী যুবকের অন্নের সংস্থান আপনি করতে পার্‌তেন। তাদেরে খাটিয়ে নিয়ে কাজের অংশীদার করতে পারতেন।"

ভদ্রলোক "সে হবার নয়, আমি দেখেছি। আমি বি, এ, এম এ উপাধিধারী কত যুবক, যারা না খেয়ে আছে, তাদেরে বলেছি তোমরা আমার সঙ্গে এসে খাট, যাতে ১০০।২০০৲ টাকা মাস হয়, তার জোগাড় করে দেব। তারা রাজী নয়, তারা পাড়াগাঁয়ে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান ও চাষাদের বাড়ীতে ঘুরতে চায় না, বরঞ্চ আমায় বলে যে 'এখানে তো আপনার একটা আফিস আছে, তাতে যদি গোটা ত্রিশেক টাকার একটা কেরাণী গিরি দেন, তবে উপকার হয়।' দুই একজন আমার কথায় ও বিশেষ অনুরোধে কাজে যোগ দিয়াছিল, তারা টিকে রইল না। রামহরি

দাস বি, এ. কার্ত্তিপাসা গিয়া গৈলা প্রভৃতি অঞ্চলে ঘুরে এসেছিল; সে বল্লে খড়ো ঘরে শুয়ে তার সর্দ্দি হয়েছে, এবং পাড়া গাঁয়ের কাঁদায় হেঁটে বাতে ধরেছে। আর দুই একজনও এসেছিলেন, এঁরা হপ্তা খানেক, হপ্তা দুই থেকে পালিয়েছেন। কেদার যে ভাবে এরা তৈরী হয়েছে, এদের দিয়ে কিছু হবে না। চিরকাল বাপ দাদা পাড়াগাঁয়ে খড়ো ঘরে থেকে অভ্যস্ত, অথচ দুরবস্থার এক শেষ, তথাপি এদের এই রকম বুদ্ধি! এরা মরবে।"

এই বলে ভদ্রলোকটি বিষণ্ণ হয়ে খানিকটা চুপ করে ব'সে রইলেন। তার পরে বল্লেন, "আদর্শ পল্লীতে এদের নূতন ছাঁচে গড়ে তুলতে হবে। না, আমাকে বাধা দিও না, এখন টাকার খবর কি?"

কেদার—"কাল ১২০৲ টাকা করে ১০০ জনের সংখ্যা শেষ হয়ে গেছে। বি, সি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা জমা হয়েছে। আপনাকে তিনি দেখা করতে বলেছেন। কালই জমি সম্বন্ধে লেখা পড়া হ'বে।

ভদ্রলোক,—"তুমি এখন যাও, আমি তাঁর কাছে কাল আফিসের সময় যাব, এবং লেখা পড়া ঠিক করব। আমাদের সিণ্ডিকেটের সদস্যদিগকে ঠিক থাক্‌তে বো'ল।"

কেদার বাবু চলে গেলে পর ভদ্রলোকটি তাড়াতাড়ি এক টুকরা কাগজে লিখ্‌লেন "হৃদয় বাবু, আমি মেস হ'তে আজ উঠে যাচ্ছি, দেনা পাওনা চুকিয়ে দিয়েছি। একশ টাকার নোটখানি পত্রের মধ্যে যা পাবেন, তা অনুগ্রহ ক'রে সন্তোষ বাবুকে দেবেন; তার আর্থিক অবস্থার কথা শুনে আমি বড় ব্যথিত হয়েছি। তিনি যদি অনুগ্রহ করে আমার নিকট হ'তে এই সাহায্য গ্রহণ করেন, তবে কৃতার্থ হব।

আপনার

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।"

আপনারা এখন বুঝেছেন, সেই ভদ্রলোকটি আমাদের পরিচিত যোগেশ-চন্দ্র রায়। তিনি স্বাধীন ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করতে কৃত সঙ্কল্প হয়েছিলেন। সে কার্য্যে তাঁর বেশ সাফল্য হয়েছিল। তার পর দেশের চারদিকে অবস্থা দেখে দেখে তিনি বুঝলেন অর্থ অর্জ্জনেই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য নয়। দেশের এই দুরবস্থা নিবারণের সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা তাঁর একান্ত কর্ত্তব্য। তিনি কেরাণী ও স্কুল মাষ্টারদের দুর্দ্দশা দেখে সময় সময় চোখের জল সংবরণ করতে পারতেন না। তারা অভাবের অতল তলে ডুবে আছেন, সারাদিন প্রাণান্ত পরিশ্রম করে যা উপায় কচ্ছেন, তাতে পেটে ভাতে কুলোয় না। কেরাণীরা শুধু আর্থিক হীন অবস্থায় পড়ে নাই, তাদের আয় অল্প হওয়ার দরুণ সাধারণতঃ তাদের মনের উদারতা সংকীর্ণ হয়ে যায়। সর্ব্বদা সাহেবদের সহযোগে কাজ করার দরুণ পরিবার বলতে তাঁদের অনেকেই শুধু স্ত্রী পুত্র বুঝেন, যত প্রকার অপমান সয়ে সয়ে চাকুরী বজায় রাখবার চেষ্টাটাই তারা জীবনের মুখ্য কর্ম্ম মনে করেন। অন্য বিভাগেও হীনতা আছে, কিন্তু কেরাণী শুধু হীন হন না, তাঁরা একান্ত দীন। এদিকে সাহেবদের দেখাদেখি ৫০।৬০৲ টাকা মাহিনার কেরাণীও চেঞ্জের জন্য শিমলা শৈল, দার্জ্জিলিঙ্গ প্রভৃতি স্থানে যাওয়াটা জীবনের একটা মস্ত বড় কাজ মনে করেন। যে কেরাণী পূজোর ছুটীতে অন্ততঃ পুরী বা দেওঘরে যেতে পারলেন না, তিনি সহকর্ম্মীদের কাছে অতি কৃপাপাত্রের মত মাথা হেঁট ক'রে থাকেন। স্কুল মাষ্টারের মাহিয়ানা ক্রমশঃ কমতে থাকে, স্কুল-গুলির আয় তো অকিঞ্চিৎকর, সুতরাং ক্রমে ক্রমে কোন কোন স্কুলে মাষ্টার মহাশয়ের বেতন না কমালে স্কুল চলে না। একজন চাকুরী ছাড়লে হাজার জন হাত পেতে থাকে, সুতরাং যতরূপ লাঞ্ছনা, অপমান সহ্য

করেও চাকুরী বজায় রাখতে হয়। একটি মেছুনীকে যদি বলা যায়, যে "তুই ঝিএর কাজ করবি ?" সে অমনিই তেড়ে উঠে দুকথা শুনিয়ে দেয়। যারা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে সুরু করে, তারা কিছুতেই পরের চাকর হ'য়ে কাজ করতে চায় না। পৃথিবীর সমস্ত জাত এ কথাটা বুঝেছে, কেবল বাঙ্গালী ছাড়া। আগে চাকরের মাসিক মাসিক মাহিয়ানা ছিল ২৲টাকা এখন ১০।১২৲টাকা। তারা জিনিসের দর বৃদ্ধির সঙ্গে মাহিয়ানা বাড়িয়ে নিয়েছে, অথচ কেরাণী ও স্কুল মাষ্টার থেকে তাদের ইজ্জতের জ্ঞান অনেক বেশী আছে। তারা একটু চোখ রাঙ্গান সহ্য করতে পারে না। কেরাণীর মাহিয়ানা সেই বিশ পঁচিশ টাকা হ'তে সুরু হয়। কালের ধর্ম্মে তাদের অবস্থার উন্নতি না হ'য়ে ক্রমে ক্রমে খারাপ হচ্ছে। কারণ বামুন বদ্দি, কায়েৎ, নাপিত, ধোপা, ছুতর, এমন কি ডোম বাগ্দী যে যার কাজ ছেড়ে দিয়ে সবাই স্কুল কলেজের দিকে তাকিয়ে আছে, নতুবা কেরাণীগিরি বা স্কুল মাষ্টারীকে লক্ষ্য করে আবেদন পাঠাচ্ছে। সমস্ত জাতি এই ছোট্ট সংকীর্ণ রাস্তাটায় ভিড় করে এমনই ঠেলাঠেলি কচ্ছে, যে নিমন্ত্রণ বাড়ীতে জীব-বিশেষের মত তাদের লাঠির বাড়ী খেতে ও অপমানিত হতে আটকাচ্ছে না। অথচ অপরাপর জাতিরা অর্থোপার্জ্জনের প্রশস্ত রাজপথ দিয়েই তাঁদের দেশের ভাণ্ডার দখল করে নিচ্চে। যোগেশ বাবু দেখ্লেন, রেস, লটারি প্রভৃতিতে দশ হাজার লোকের মধ্যে অন্ততঃ ১০০ শত লোক কিছু কিছু লাভ পায়, কিন্তু একটা চাকুরী খালি পড়িলে সহস্র সহস্র আবেদনকারীর মধ্যে একটি লোক মাত্র তা পেয়ে থাকে। সুতরাং চাকুরী, লটারী ও জুয়োখেলা হ'তেও অধম হয়ে পড়েছে। বঙ্গদেশের এই নিদারুণ অবস্থায় প্রতি ঘরে ঘরে শকুনি পড়েছে। যিনি দুই চারি শত টাকা বেতন পান, যদিও তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয়, তিনি ও মারা গেলে, তাঁর ছেলে মেয়ে পথে দাঁড়াবার অবস্থায় পড়ে। এদেশ ভগ্ন রাজপ্রাসাদের

দেশ—জীর্ণ মন্দিরের দেশ। এদেশের দীর্ঘ শাখাও শিকের-বহুল প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা কর, সে শিশিরাশ্রু বর্ষণ করে বল্‌বে বঙ্গপল্লীর যে এক সময়ে কত সুখ দেখেছিল, এখন কত দুঃখই না দেখ্‌ছে। এই দুঃখের সংসারে বাঙ্গালী নির্ম্মম পাষাণ হয়ে আছে। পরের চোখের জল দেখ্‌লে আর তার দয়া হয় না, দয়া দেখাবে কি করে? এ অশ্রু—এই আষাঢ়ে পদ্মার বন্যা—এ কোন্ কুবেরের চেষ্টায় নিবারিত হ'তে পারে? যেখানে না খেয়ে লোক মর্‌ছে, সেখানে আমরা চোখ বুজে চলে যাই; আত্মীয় স্বজনের দুঃখকে দুঃখ বলে মনে করিনি, মনে ক'রেই বা কি করব?

যোগেশের বুক ভেঙ্গে তার কতকগুলি উপদেশ-বাণী মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগল। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পাছে তোদের শরীরটা নষ্ট করিস্ না, আর সর্ব্বস্বান্ত হয়ে শুকনো উপাধি পাওয়ার লোভে দেহপাত করিস না। আর চাকুরীর চেষ্টায় ঘুরিস না। আর সংবাদপত্র খুঁজে খুঁজে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভ দেখিস্ না। যদি সারাদিন ঝিনুক দিয়ে সমুদ্র ছেঁচিস, তবে সমুদ্রের জল কমাতে পারবি না। শত শত আবেদন পাঠিয়ে পোষ্ট আফিসের আয় বৃদ্ধি করবি মাত্র, চাকুরী জুট্‌বে না, চাকুরী পেলেও পেট চল্‌বে না। রোজ ছয় সাত ঘণ্টা কোন বিষয়ে স্বাবলম্বন ক'রে কাজ ক'রে দ্যাখ্! কি কাজ করবি, তা তুই নিজে ঠিক করবি, যা ক'রে অর্থ হয়,—প্রতিষ্ঠা হয়, শত শত ভিন্ন দেশী লোক যা ক'রে তাদের কাজ হাসিল করে সেই রকম কোন একটা পথ মনোনীত ক'রে রোজ কাজ কর। ঘড়ির কাঁটা দেখে কাজ করবি, ঘড়ির কাঁটার মত নিশ্চিত ভাবে কাজ করে যাবি। মেঘের ডাক শুনবি না, অশনিপাত শুনবি না, ঝঞ্ঝার শব্দে ভয় পাবি না। রোজ এক মনে কাজ করবি। রাত্রে তাঁকে বলবি 'তুমি যে আঠার ঘণ্টা সময় দিয়েছিলে তার মধ্যে আমি এই দ্যাখ দশ

বার ঘণ্টা খেটেছি।' কিন্তু আরজি করা পরিশ্রম নয়, খোসামুদি করা কাজ নয়,—তুই, সেই আবেদন ও খোসামুদি সারাদিন করে মনে করিস না যে তুই ব'সে রস নাই। সেতো মনকে চোখ ঠেরে ভুললি, সেওরা গাছ বুনে নেংড়া আমের আশায় ব'সে রইলি; এ ব্রতের এ কথা নয়। দেখ অপরাপর জাতিকে, তারা তো কেউ আরজি হাতে ক'রে বসে নেই। ও যে ভিক্ষারই নামান্তর। "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।" তারা কেউ প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছে, কেউ আট্‌লান্টিকের বক্ষভেদ করে ছুটেছে, কেউ উটের পিঠে চ'ড়ে সাহারা মরুভূমি ডিঙ্গিয়ে আস্‌ছে, কেউ বুনো হাতীর মুখে প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে ব্রহ্মদেশে শালের বনে ঘুরছে। একবার স্বাবলম্বন করে দেখ, চাকুরী আর কিছুতেই তোর ভাল লাগবে না।'

যোগেশ বুঝলেন, এ সকলে বলে বুঝোবার কথা নয় দৃষ্টান্ত দেখিয়ে লোককে এই পথে আন্‌তে হবে। জীবনপাত না করলে দেশকে বুঝান যাবে না। এতগুলি অসার দেহে জীবন সঞ্চার করতে হ'লে সে কি শুয়ে শুয়ে শুধু উপদেশ দিয়ে বোঝাতে পারা যাবে? কত বড় প্রাণ, কত বড় তপস্যা দিয়ে এই কাজ করতে হবে! তাই তিনি অক্লান্ত ভাবে নিজেকে সেই তপস্যায় নিযুক্ত ক'রে দিলেন।

১৮

যোগেশবাবু রাণাঘাটের জমিদার কালীকান্ত রায় মহাশয়কে বল্লেন "রেলের দুই দিকে তোমার অনেক জমি পড়ে আছে। এক লপ্তেই কোন কোন জায়গায় দেড় হাজার দুই হাজার বিঘে জমি পতিত রয়েছে। এগুলি দিয়ে কিছু করবে তার মতলব করেছে?"

কালীকান্ত বাবু যোগেশ বাবুর সহধ্যায়ী, তিনি বল্লেন "কি করব ভাই!

এখানে চাষী পাওয়া যায় না ম্যালেরিয়ার জন্য লোক-বাস উঠে গেছে, এ অবস্থায় আমার পিতামহ স্বর্গীয় সারদাকান্ত রায় যে ভাবে আমার পিতা স্বর্গীয় রমাকান্ত রায়কে উত্তরাধিকার-সূত্রে মালীকানা দিয়ে গেছেন, আমি কালীকান্ত রায় সেই আইন অনুসারে এগুলির দখলকার হয়েছি। এগুলি যে কি কাজ হ'তে পারে তা তো বুঝি না।"

যোগেশ। "এ থেকে রেলের কাছে দেড় হাজার বিঘা জমি আমায় দাও না, আমি ৯৯ বছরের জন্য মৌরসী চাচ্ছি। নগদ তোমায় পনের হাজার টাকা দেব। এবং পাঁচ বৎসরান্তে বিঘা পেছু বাৎসরিক ।০ আনা খাজনা দিব।"

কালীকান্ত বাবুর বাড়ীটা ভূমিকম্পে ধ্বসে পড়েছিল, তা মেরামত করতে হয়েছে। তার উপর বাড়ীতে তিন তিনটা মেয়ে বিয়ে সম্প্রতি হয়ে গেছে। এ ছাড়া সখ্ করতে গিয়ে ছয় হাজর টাকা দিয়ে একটা মটর গাড়ী কিনেছেন। টাকার বিলক্ষণ খাকতি। এই পতিত জমিগুলি দিয়ে পনের হাজার টাকা পাওয়ার সম্ভাবনায় তিনি খুবই খুসি হ'লেন। কিন্তু বাইরে জমীদারী চাল ছাড়বেন কেন? তিনি বল্লেন "ত্রিশ হাজার টাকা পেলে ছাড়ি।"

যোগেশ বাবু বল্লেন—"তবে ভাই উঠি! তুমি যদি ১৫০০ বিঘা জমির দরুণ ত্রিশ হাজার টাকা পাও, তবে চেষ্টা করে দেখ, সাহেবদের মিল-টিল হলে ঐ দাম তারা দিতে ও পারে।"

কালীবাবু। "আরে ভায়া উঠ্‌ছ কেন? এখানে মিল-টিল হবে না, আমি জেফ্রি-ব্রাদাসদের অনেক দরবার করে দেখেছি, ভাই একসঙ্গে পড়েছি। তুমি কি আর কিছু বেশী আমায় দিতে পারবে না। না পার্লে তোমার মত বন্ধুকে কি আমি ফিরিয়ে দিতে পারি?

যোগেশ। আমাকে তিন মাস সময় দিতে হবে। এই পনের হাজারের

বেশী কি ক'রে হ'বে? এই টাকা তুলতেই আমার বেগ পেতে হবে। তুমি রাজী থাকলে আমি বোধ হয় তিন মাসের পর তোমাকে টাকা দিতে পারব।"

কালী। "এখন কি বায়না করবে। এ জমি দিয়ে কি হ'বে?"

যোগেশ। "কি হবে তা শেষে জানতে পারবে, তোমার জমির উন্নতি ছাড়া অবনতি হবে না। আমি এখন বায়না করব না। একেবারেই টাকা দিয়ে লেখাপড়া ক'রে নেব।"

এই ব'লে বেশী দেরি না ক'রে 'জরুরী কাজ আছে' বলে যোগেশ বাবু চলে গেলেন। কালীকান্ত ভাবলেন "যোগেশ কি ধাপ্পা দিয়ে গেল? ও ত আগে একটা কেরাণীগিরি করত, সাহেবদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে সে কাজ ছেড়ে দিয়েছে, শুন্‌ছি। এখন কি কচ্ছে? একসঙ্গে পনের হাজার টাকা এ ব্যক্তি দেবে কোথেকে?"

সুতরাং এই টাকাটা তিনি একবারে "করতলগত আমলকীবৎ" বলে মনে করতে পারলেন না।

১৯ *

সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার বি, সি, ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে যোগেশ বাবু দেখা ক'রে তাঁর প্রস্তাবটি বুঝলেন। অনেক সওয়াল জবাবের পর মিঃ ভট্টাচার্য্য যোগেশ বাবুর প্রস্তাবটি কার্য্যকরী বলে স্বীকার করলেন? এ[illegible]ন রক্ষক হ'তে কবুল হ'লেন।

প্রস্তাবটি সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি একটা খবর জানতেম, তবে

---

* গল্পের ভিতর নীরস প্রস্তাবনাটি দেওয়ার জন্ত শুধু গল্প-কৌতুহলী পাঠকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কচ্ছি। তবে প্রস্তাবনাটি বহু চিন্তার ফল, সুতরাং কোন কোন পাঠক ইহার উপকারিতা স্বীকার করিতে পারেন।

সম্প্রতি একখানি মুদ্রিত পুস্তিকা আমরা পেয়েছি তা'তে বিস্তারিত অনেক কথা আছে, আমরা এই পুস্তিকাখানি পুনঃ মুদ্রিত করলেম, আশা করি কপি রাইটের দায়ে পড়িব না।

"দেড় হাজার বিঘা জমি দ্বারা একটি পল্লী তৈরী হবে। পল্লীর নাম হবে আদর্শ-পল্লী।

এই জমি একশত ক্ষুদ্র পবিবারে মধ্যে ভাগ হবে। প্রত্যেক পরিবারের একজন নিয়ে একশত সদস্য দ্বারা আদর্শ-পল্লীসঙ্ঘ গঠিত হবে।

এই একশত সদস্যের মধ্য থেকে পঁচিশজন বেছে নিয়ে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গড়া হবে।

জমির দাম পনের হাজার টাকা ও সরঞ্জাম খরচ বাবদ দুহার হাজার টাকা মজুত থাকবে।

প্রথম বার এক এক পরিবারকে, দুইশত পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে। ঐ টাকা বি, সি, ভট্টাচার্য্যের কাছে পৌঁছা মাত্র জমি খরিদ করা হবে। জমি "আদর্শ-পল্লীসঙ্ঘে"র নামে খরিদ হবে।

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ২৫০ টাকা দেওয়া মাত্র প্রত্যেক পরিবার পনের বিঘা জমির মালিক হইবেন। একশত পরিবার প্রত্যেক ২৫০ টাকা দিলে মোট পঁচিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হ'বে। তন্মধ্যে জমির মূল্য পনের হাজার টাকা গেলে, রেজেষ্টারিও দলিল তৈরীর খরচ বাদে, বাকী কয়েক হাজার টাকা ব্যারিষ্টার মহাশয়ের হাতে সরঞ্জামী খরচ হিসাবে মজুত থাকবে।

জমি খরিদ ক'রে সঙ্ঘ প্রত্যেক পরিবারের নিকট পুনরায় ২৫০ টাকা দাবী করবেন। তাতে পঁচিশ হাজার টাকা উঠবে। এই টাকার নিম্ন লিখিত ভাবে ব্যয় হবে।

প্রত্যেক পরিবারের বাসোপযোগী এক একটি এক বিঘার প্লট।

বাস-বাড়ীর যথাসম্ভব নিকটে চাষবাসের জন্য নয় বিঘার আর একটি প্লট। এক বিঘা-পরিমিত সাতটি পুকুর। চাকর-বাকরদের ও ধোপা নাপিত, ধাঙ্গড় মেথর প্রভৃতি জাতীয় লোকের জন্য বস্তি। বাজারের জন্য প্লট, স্কুল ঘর, মেয়ে পাঠশালা, মেয়েদের ও ছেলেদের বেড়াবার জন্য স্কোয়ার, লাইব্রেরী, মুদিঘর, ষ্টেশনারী প্রভৃতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্লট। তা ছাড়া রাস্তা ঘাট জল নিঃসরণের জন্য পয়ঃ-প্রণালী।

এই পঁচিশ হাজার টাকা পাওয়া মাত্র সভ্য তাহা মার্টিন কিম্বা অন্য কোন প্রসিদ্ধ কোম্পানির হাতে দেবেন। তাঁহারা ঐ টাকায় সাতটি পুকুর তৈরী করে যে মাটী পা'বেন, তদ্দ্বারা একশত পরিবারের জন্য একশত উঁচু প্লট, তদ্‌সংলগ্ন নয় বিঘা চাষের জমিতে জল যাওয়ার বন্দোবস্ত, রাস্তা ঘাট, বাজার ইত্যাদির উপযুক্ত প্লট নির্ম্মাণ ক'রে দেবেন। পুকুরের ধারে খুব প্রশস্ত রাস্তা ক'রে জমি এমন ঢালু করে দেবেন যাতে কোন স্থানে বিন্দুমাত্র জল দাঁড়াতে না পারে।

বৃক্ষাদি আপাততঃ একটিও থাক্‌বে না, পল্লীটি কোন রূপে অপরিষ্কৃত না হয়, তার দিকে দৃষ্টি থাক্‌বে।

এই পঁচিশ হাজার টাকার শুধু পুষ্করিণী খনন এবং জমি ও রাস্তাঘাট তৈরী হইবে।

সুতরাং প্রত্যেক পরিবার ৫০০ শত টাকা দিয়া প্রত্যেক এক বিঘার বাস বাড়ীর প্লট, নয় বিঘার কৃষির জমি এবং রাস্তাঘাট পুকুর প্রভৃতি সাধারণের সম্পত্তির যথোচিত ভাগের অধিকারী হ'বেন। টাকা দিয়ে একদিনের জন্যও পরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাক্‌তে হবে না, কারু তহবিল তছরূপ করিবার সম্ভব থাক্‌বে না। হাতে হাতে অর্থের উপযুক্ত অধিকার লাভ করবেন।

পাঁচশত টাকার আদায় হওয়ার পরে সভ্য প্রত্যেক পরিবারের নিকট

পুনরায় ৩৫০০৲ টাকা চাইবেন। তাহাতে মোট সাড়ে তিন লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে।

এই টাকা তৎক্ষণাৎ মার্টিন বা অন্য কোন কোম্পানির হাতে দেওয়া হইবে।

প্রত্যেক পরিবারের বাড়ীর দরুণ এক বিঘা জমি দুইটি ভাগ হইবে। পাঁচ কাঠার উপর দুইখানি শোবার জন্য মাটির গাথঁনি ইটের ঘর, আস্তর দিয়ে ঠিক পাকা ঘরের মতই দেখতে হবে, উপরে রাণীগঞ্জের টালি, ঐরূপ একটি পরিবেশনের ঘর, রান্না ঘর, বাহিরে ঘর এবং বাথরুম। দুই কাঠার মধ্যে ছোট্ট খাট বাড়ীটি হবে। তিন কাঠার আঙ্গিনা থাকবে। আর পাঁচ কাঠার ফুলের বাগান থাকবে। এবং বাকী দশ কাঠায় তরি-তরকারীর বাগান হবে। একটি কলমের নেবু বা ন্যাংড়া আমের চাড়া থাকতে পারে, কিন্তু যাতে ঝাপসা হয়, এমন গাছ থাকবে না। এই এক বিঘার বাড়ীটি চারদিকে বাঁশের বেড়া রঙ্গিন করিয়া দেওয়া হবে, তার মধ্যে মাধবী বা সপুষ্প অন্য লতার ঘের দেওয়া যাইবে। গৃহস্থের নয় বিঘা চাষের জমি থাকবে সে সম্বন্ধে পরে লিখিতেছি।

সাড়ে তিন লাখ টাকা দিয়া এই বাড়ী নির্ম্মাণ ছাড়া বাজার, মুদিখানা, স্কুল, লাইব্রেরী প্রভৃতি মার্টিন কোম্পানি (বা অন্য কোম্পানী) অতি অল্প মূল্যে অথচ সুরুচির অনুমোদিত ভাবে নির্ম্মাণ করে দিবেন। রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও লাল সুরকী দেওয়া থাকিবে। স্কোয়ারগুলিতে লৌহ-তারের বেড়া দেওয়া হবে। ছোট ছোট পয়ঃপ্রণালী এমন ভাবে ঢালু জমির উপর তৈরী করা হবে, যাতে গ্রামের সমস্ত জল সুদূর নিম্ন পতিত জমিতে নিকাশ হয়ে যেতে পারে।

গৃহস্থ মোট চার হাজার টাকা দিয়ে এইরূপ পল্লীর অধিবাসী হইয়া মোটা ভাতে মোটা কাপড়ের ব্যবস্থার দাবী ক'রতে পা'রবেন।

কৃষক পাওয়ার সুবিধা অল্প, সুতরাং ঐ নয় বিঘা কৃষি জমিতে যদি শুধু কলাগাছ জন্মান যায়, তবে তাহাতে অন্ততঃ বৎসর তিন হাজার টাকা পাওয়া যাইতে পারে। আনারস ও মানকচুতে বেশ লাভ হয়, অথচ এই সকল ফসল ধান চালের মত অনিশ্চিত নহে। ইহাতে গৃহস্থের বেশী কিছু দক্ষতা বা লোকজন নিয়োগেরও দরকার হইবে না। বানর, শূকর প্রভৃতির হস্ত হ'তে ফসল রক্ষা করতে হবে, তা একটা বন্দুক বা অন্য কোন অস্ত্র থাক্‌লেই হতে পা'রে।

এই জমি হ'তে কলকাতা সেয়ালদহ রেলে পৌঁছিতে ১½ ঘণ্টা লাগ্‌বে। ট্রেণে ৯টায় রওনা হয়ে ৬টায় বাড়ীতে ফেরা যাবে। এক ভাই যদি কলিকাতায় কাজ করেন, আর এক ভাই গ্রামে বাস ক'রে নিজের ক্ষেত-খামার দেখে ঘর আগ্‌লে থাক্‌তে পারবেন।

কিন্তু এই গ্রামের আসল সুবিধার কথা এখনও বলা হয় নাই।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির ছয়টি শাখা থাক্‌বে। এক শাখা—স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয়। ইঁহারা গ্রামের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখবেন, কোন্ সময়ে কোন্ ঋতুতে কোন পীড়ার আবির্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কি উপায়ে তাহা দূর করা যায়—তাহাই নির্দ্দেশ করা ইহাঁদের কাজ। গ্রামের আবর্জ্জনা, দূষিত হাওয়ার প্রতি ইঁহারা দৃষ্টি রাখবে। কোন বাড়ীতে কোন পীড়া হইবে ইঁহারা তত্ত্বাবধান করবেন, এবং কোন ছেলে রোগা থাক্‌লে কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাকে সুস্থ ও সবল ক'রে তুলতে চেষ্টা পাবেন।

দ্বিতীয় শাখা শিক্ষা সম্বন্ধীয়—কোন্ ছেলের কোন্ দিকে শিক্ষার স্বাভাবিক শক্তি আছে, তা আবিষ্কার করে তাকে সেই দিকে তাঁরা সুযোগ করে দেবেন। যে গণিত বোঝেনা, তাকে বীজগণিতের সমস্যা পূরণ করতে দিয়ে ক্রমাগতই তাঁর মাথা গুলিয়ে দেবেন না। কেহ শিক্ষা

সম্বন্ধে পশ্চাৎপদ থাকিলে বাড়ী বাড়ী ঘুরে সেই সকল বালকের শিক্ষার সুযোগ ক'রে দেবেন। তাহা ছাড়া যা'তে পাব্লিক লাইব্রেরী, ল্যাবরেটারী প্রভৃতির উন্নতি করা যায়, তাহা ইহাঁরা নির্দ্দেশ করবেন এবং প্রয়োজন হ'লে প্রেস স্থাপন করে পল্লীর উন্নতির জন্য ইহাঁরা কাগজ বাহির করিতে পা'রবেন। ছেলেদের ব্যায়ামের বন্দোবস্ত ইহাঁদেরই হাতে থাকবে।

তৃতীয় শাখা—বাণিজ্য সম্বন্ধীয়। গ্রামে ষ্টেসনারী, মুদিখানা, এ সমস্তই গৃহস্থ-সমবায়ের দ্বারা চালিত হইবে। যে পরিবারের যত টাকার জিনিষের প্রয়োজন—অবশ্য মাংস, শাক-সব্জী প্রভৃতি ছাড়া—তদনুসারে সঙ্ঘের হস্তে গৃহস্থ টাকা প্রদান করবেন। সঙ্ঘ পরিচালিত দোকান উৎকৃষ্ট খাদ্য বাজার দরে বিক্রয় ক'রে যিনি মাসিক যত টাকার জিনিষ গ্রহণ করবেন, বৎসরান্তে তদনুযায়ী লাভ, তাঁহাকে হিসাব ক'রে দেবেন। ইহা ছাড়া যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তাঁহার কৃষি জমির ভার নিজে না রেখে সঙ্ঘের হাতেই দেওয়া সুবিধাজনক—তবে বাণিজ্য শাখা তার ভার গ্রহণ করে খরচ কেটে রেখে লাভ তাঁহাকে দিতে বাধ্য থা'কবেন। বাণিজ্য শাখা সঙ্ঘের সদস্যদের নিকট হইতে টাকা নিয়ে একটা ব্যাঙ্ক খুলবেন—তা'তে উচিত সুদ নিয়ে সদস্যদিগকে ধার দেওয়া যেতে পা'রবে। যদি কেহ শেষ কিস্তির ৩৫০০৲ টাকা এককালে না দিতে পারেন, তবে বাণিজ্য-শাখা ব্যাঙ্ক হ'তে কতক টাকা দিয়ে তাঁহার সহায়তা করতে পারেন। এইরূপ সাহায্য প্রাপ্তির উপর কোন দাবী দেওয়া থাকবে না, তবে সঙ্ঘ স্বীয় পল্লীটিকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করতে যত্ন পাবেন, ইহাতে এই কথাটা বোঝা যাবে। বাণিজ্য শাখা গৃহস্থদের কাছ থেকে টাকা তুলে ধান চাল, তিল, পাট, গোধুম, যব প্রভৃতির ব্যবসা চালাতে পারেন।

চতুর্থ নীতি-শাখা। এই শাখা সমস্ত ঝগড়া বিবাদ মিটাতে চেষ্টা

করবেন। যারা সঙ্ঘের শাসন মানবেন না, তাদের এ পল্লীতে বাস করা সুবিধাজনক হবে না। সুতরাং যত ঝগড়া বিবাদ তৎসম্বন্ধে নীতি-শাখার মীমাংসাটা চূড়ান্ত ব'লে মেনে নিতে হবে। স্ত্রীলোকেরা নিমন্ত্রণ উপলক্ষে বেশী গহনা পরে বিলাসের দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন না। এ সম্বন্ধে কোন জোর খাটবে না। কিন্তু নীতি-শাখা এমন একটা প্রভাব বিস্তর করবেন, যাতে বিলাস ও পল্লীর নৈতিক আবহাওয়াটা দুষ্ট না করতে পারে। পুরুষেরা বাড়ীতে আট হাত ধুতি পরে থাকাটা লজ্জার কারণ বলে মনে করবেন না।

যদি এই পল্লী ছেড়ে কোন গৃহস্থের পরিবারকে দূরে যেতে হয়, তৎসম্বন্ধে নীতি-শাখা তদন্ত করবেন। বহু ব্যয়সাধ্য ভ্রমণাদির জন্য অর্থক্ষয়ের দৃষ্টান্ত কখনই তাঁরা সমর্থন করবেন না।

পঞ্চম পূর্ত্ত-বিভাগ—দীঘির সংস্কার, জলের ব্যবস্থা, সাঁকো প্রস্তুত, নূতন পয়ঃপ্রণালী খনন, সাধারণের গৃহ বাটিকার মেরামত—বাগান ইত্যাদি কাজের ভার এই বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকবে।

ষষ্ঠ, ধর্ম্ম-বিভাগ—এই বিভাগের সদস্যেরা নানারূপ ধর্ম্মোপদেশ, কীর্ত্তন, কথকতা, বক্তৃতা, পূজা, উপাসনা প্রভৃতির ব্যবস্থা ক'রে পুরুষ ও মহিলাদের মন ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য যারা এই পল্লীবাসী হবেন, তাদের এই কয়েকটি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

১। সঙ্ঘের বাড়ী নির্ম্মাণ হ'লে তাদের এক মাসের মধ্যে সপরিবারে এখানে উঠে আসতে হবে।

২। একাদিক্রমে দুই মাসের ঊর্দ্ধ কাল কেহ বিশেষ কারণ ভিন্ন মেয়েদের এই গ্রাম ছাড়া ক'রে রাখতে পারবেন না।

৩। যদি কেউ তাঁর বাড়ী বিক্রয় করতে চান, তবে তাঁর যা খরচ

পড়েছে, তাঁর উপর শতকরা সাত টাকা বাৎসরিক সুদ ধরে সত্মকেই উহা বিক্রয় করতে হ'বে।

মোট কথা এই পল্লীকে পবিত্র মনে করতে হবে, ইহা বিকিকিনির জিনিষ বলে যেন কেহ মনে না করেন। যাঁরা এখানে বাস করবেন না, তারা যেন শুধু অর্থবলে এক বা ততোধিক বাড়ী ক্রয় ক'রে ফেলে না রাখতে পারেন, এবং দাম বৃদ্ধি হ'লে ছেড়ে দিয়ে লাভ করব—এ প্রতীক্ষা না করে থাকেন। এই পল্লীর মাটি পবিত্র—ইহা প্রাণাধিক প্রিয় মনে করে ইহার অধিবাসী হ'তে হবে।"

আমরা এই পুস্তিকাখানি দৈবক্রমে কুড়িয়ে পেয়েছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যোগেশবাবু টের পেলে এখানি এই [illegible]ন্নের ভিতর ছাপ্তে দিতেন না।

২০

ভট্টাচার্য্য সাহেব বল্লেন এমন অল্প সময়ের মধ্যে যে টাকাটা উঠে যাবে এবং গ্রামখানি তৈরী হয়ে যাবে, তা তো আমরা মনে করতে পারি নাই।

যোগেশবাবু বল্লেন "দেখ্ছেন না, ম্যালেরিয়ার গতিকে দেশে থাকতে না পেরে কল্‌কাতার অলিগলির নরকে ভদ্রলোকেরা বাস কচ্ছেন। কত জুয়োচোর যে নানা ফন্দী ক'রে তাদের বাড়ী করে দেবে ব'লে ঠকিয়ে টাকা নিচ্ছে! এদিকে গরীব লোকেরা যত টাকা বাড়ী ভাড়ায় দিয়েছে—তা দিয়ে তারা এক একজনের একখানি বাড়ী করতে পারতেন।

"আমাকে যে কি খাটতে হয়েছে, তা আর কি বল্‌ব। ভাগ্যিস্ আমি কারবারটা ফেঁদেছিলাম, তাতে বহু লোকের বিশ্বাস আমি আকর্ষণ করতে পেরেছি। আমি এর মধ্যে আছি জেনে নিশ্চিন্তভাবে তাঁরা টাকা দিয়েছেন।

ভট্টাচার্য্য—"এখন গৃহপ্রবেশ কবে হবে ?"

সহসা যোগেশের মুখে কালীর মত একটা আবছায়া প'ড়ে গেল। তিনি বল্লেন "সিণ্ডিকেট ডাকুন, সকলেরই ত পরিবার নিয়ে আসতে হবে ?"

ভট্টাচার্য্য। "আপনার পরিবার কোথায় ?"

যে দুঃসহ দুঃখে যোগেশের অস্থি-পঞ্জর কাঁপছিল, যা বাণের মত জোরে তার চক্ষে জল আন্‌ছিল, সেই দুঃখ—সেই অশ্রু জোর ক'রে নিরোধ করে যোগেশ বল্লেন—

"সে হবে, আপনি প্রেসিডেণ্ট, আপনার শ্যালীপুত্র ও ভাগিনেয়ের নামে দুইখানি বাড়ী আছে—তাঁদেরে ডাকুন। সিণ্ডিকেটের সুবিধা অনুসারে দিন ঠিক হবে—কিন্তু আজ থেকে দেড় মাসের বেশী যেন দেরী না হয়।"

"আমাদের এই পল্লীর অনুকরণে নাকি আরও কয়েকখানি পল্লী হবার চেষ্টা হচ্ছে।"

"হবে না ? আমাদের দেশ এইরূপ পল্লীতে ছেয়ে যাবে। বাঙ্গালীর উত্তম নিরুদ্ধ হয়ে আছে। যুবকেরা কি কর্‌বে ঠিক করতে পাচ্ছে না, কেউ অরাজকত্ব আন্‌তে গিয়ে ফাঁসিতে ঝুল্‌ছে, জেল খাট্‌ছে। কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সমস্ত শক্তি বিদ্যা বুদ্ধি নিলেম করে ফেলে ঠুঠো জগন্নাথ সেজে কলম পিষ্‌ছেন, না হয় ছেলে পড়াচ্ছেন। একটা প্রবল শক্তি-সঙ্ঘ হ'তে পারে নি, কখনও তা' সলতের আলোর মত জ্বলে উঠে দমকা হাওয়ায় নিবে গেছে। কখনও তা জোটপাট বেঁধে একটা রাজনৈতিক দল বেঁধে শেষটায় কেউ এপ্রুভার সেজে বা টিক্‌টিকি হ'য়ে এ ওর গলায় দড়ি দিচ্ছে। এই শক্তির প্রকৃত নিয়োগের পথ আমরা আজ দেখালুম। আমার কাছে সাতখানি চিঠি এসেছে। যুবকেরা জমি ঠিক করেছে, তারা আমাদের মত আদর্শ-পল্লী গঠন কর্‌বে। আমাকে তারা প্রেসিডেণ্ট করে কাজে

লাগাবে এই ইচ্ছা। তবু তো আমরা গ্রামে গিয়ে কাজ সুরু করি নাই। আমরা দেখাব আট হাত জোলার ধুতি পরে এরূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করা যায়, যাতে পৃথিবী চমৎকৃত হবে, আমরা ঐ পল্লীতে ব'সে ভারতীয় ধর্ম্ম, ভারতীয় ইতিহাসের এমন সাধনা করব, যাতে করে 'আদর্শ পল্লীতে' ভারতীয় প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। আমরা যদি দশখানি পল্লী এমনই গড়তে পারি, তবে আর এক হাজার পল্লী এমনই হবে। বাঙ্গালী একটা কাজ সার্থক করে তুলতে পারলে, সে কাজের অনুকরণ করবার লোকের অভাব হ'বে না। দুঃখের বিষয় তারা পয়সা কড়ি দিয়েছে, সময় ও শক্তি দিয়েছে, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়েছে, কিন্তু তাদের কোন উদ্যম সার্থক করতে পারে নি। এই উদ্যম সার্থক ক'রে আমরা স্বাবলম্বন শিখব, নিজেরা ক্ষুদ্র একখানি গ্রাম ড়তে পারলে দশখানি সহর গড়ার শক্তি আপনা আপনি অর্জ্জিত হ'বে। তখন আমরা রেল চালাব, ষ্টীমার গড়ব, চাই কি আবার সিংহল বা জাভায় গিয়ে বাঙ্গালীর ধ্বজা উড়ুতেও বা পারব।"

ভট্টাচার্য্য। "আপনার উৎসাহ ও কর্ম্মঠতা ঠিক একটা দেশলাইয়ের কাঠির মতন, তা দিয়ে আপনি একটা পর্ব্বতকেও জ্বালাতে পারেন। আচ্ছা আপনি যা করলেন, যে কোন জমিদার তো তা অনায়াসে ক'র্‌তে পারেন।"

যোগেশ। "দেশের বড়মানুষগুলি যদি বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হ'তেন, তবে কি আর দুঃখ ছিল! ইচ্ছা করলে তো এক একজন জমিদার এরূপ অনেকগুলি গ্রাম পত্তন করে নিজেরাও লাভবান হ'তে পারতেন। মিলওয়ালারা তো নিত্যি পল্লী তৈরী করছে।"

ভট্টাচার্য্য। "পুরাতন পাড়াগাঁগুলি সংস্কার করে তো আমাদের কাজে [illegible] যেতে পারে।"

[illegible]গেশ। "সে আশা ছেড়ে দিন; ঐ সকল গ্রাম ঘুরে ঘুরে আমি

চেষ্টার কসুর করিনি। একটা পথ বার করতে হ'লে দশ সরিকে লাঠালাঠি হবে। নিজের ব্যয়ে পুকুর সাফ করতে গেলে লাঠি নিয়ে হা হা করে এসে বাধা দেবে। মশার ঝাঁক তিরিশটা আগাছা অবলম্বন ক'রে ম্যালেরিয়ার বীজাণু ছড়াচ্ছে,—সেই গাছের ডাল কাটতে গেলে অমনই আওলাত নষ্ট করলে বলে থানায় নালিস করবে। আঁধারে পথে সাপের হাতে মরবে, শেয়াল কুকুর দংশন সহ্য করবে, তবু আলোর জন্য মাসিক এক আনা চাঁদা দেবে না। এ দিকে বিনা কারণে জ্ঞাতির সঙ্গে ঝগড়া ক'রে মাথা ফাটাফাটি ক'রে বাসভূমি বন্ধক দিয়ে টাকা কর্জ্জ করে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মাম্‌লা চালাবে। দিন রাত দাবা পাশা খেলে সময় কাটাবে—বর্শী হাতে ক'রে সারা দিন পুকুর পারে ঝিমুবে, তবু কোন কাজ করবে না। সময়টা তো ভগবান সবাইকে দিয়েছেন—তার চাইতে তো মূল্যবান কিছু নেই। যার দেশের এরূপ দুর্দ্দশা, তার কত কাজ—সে কাজের অন্ত নেই। এঁরা একেবারে অকেজো হয়ে নানা কষ্ট সয়ে জীবনটা নষ্ট করবে। উপদেশ, অনুরোধ সব বৃথা—মিথ্যাচার, কপটতা, আলস্য—দারিদ্র্যের সঙ্গী তারা পল্লীজীবনকে হেয় ক'রে ফেলেছে।

"এই পল্লীসংস্কারের চেষ্টা বৃথা, তা পারেন সরকার বাহাদুর, পুলিস দিয়ে চোখ রাঙ্গিয়ে। ভাল কথা ব'লে পিঠ চাপড়ে তা হবার উপায় নাই। আঁধাব দূর করতে গেলে আলো আনা চাই, বক্তৃতায় তা হয় না। এই সকল প্রাচীন পল্লী যখন আদর্শ-পল্লী দেখ্‌বে—তখন ধীরে ধীরে তাদের প্রকৃত সংস্কার আরম্ভ হবে। সূর্য্যোদয় হ'লে দোর বন্ধ কর্‌লেও তার রশ্মি ফাঁক দিয়ে ঢুক্‌বে। এই আদর্শ-পল্লীই হচ্ছে বাঙ্গালী-জীবন রক্ষার একমাত্র অবলম্বন। তা না হ'লে বিদেশী সভ্যতার আওতায় ও বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঙ্গালী টিকে থাক্‌তে পার্‌বে না। টিকে থাক্‌তে হ'

আমাদের সাহেবের তৈরী সহর থেকে মায়ের ডাক শুনে আবার ঘরে ফিরে যেতে হবে।"

যতক্ষণ আবেগের সঙ্গে যোগেশ ঝাপটা বাতাসের মতন কথাগুলি ব'লে যেতে লাগ্‌লেন, ততক্ষণ ভট্টাচার্য্য সাহেব নির্নিমিশ চক্ষে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর উদ্যম, তার ব্যথাভরা প্রাণের উপলব্ধি, তার দেশের জন্য কাতরতা—সেই কটূক্তিপূর্ণ নিন্দা সত্ত্বেও তার কথাগুলির ভিতর স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। তা' ভট্টাচার্য্য সাহেবের মনের অন্তরতম দেশ ছুঁয়ে যোগেশবাবুকে তাঁর যেন বেশী করে বুকের কাছে টেনে আনলে।

২০

যোগেশবাবু চার পাঁচ মাস শতদলের কোন খবরই পান নি। তিনি পিতৃগৃহে সুখে আছেন, এবং বিপিনের পড়াশুনার একটা বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই হয়েছে এই মনে করে কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। যদিও শতদলের টাকা ফিরিয়ে দেওয়া এবং সেই নির্ম্মম চিঠির কথা যখনই তাঁর মনে পড়ত, তখনই বুকের ভিতর একটা কাঁটা বিঁধত। "তাই হোক, শতদল, আমি তোমার হতভাগ্য স্বামী,—আমাকে চিঠি লিখ্‌তে মানা করেছ, আর তোমায় চিঠি লিখব না।" এই ভেবে বিমর্ষ হয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তেন।

কিন্তু ছাড়াছাড়ি হওয়ার প্রায় ৮।৯ মাস পরে তিনি একদিন তেনাই গ্রামের এক আত্মীয়ের মুখে সব খপর জান্‌তে পার্‌লেন। শতদল নিজের খরচ নিজে চালিয়া আছেন, বাড়ীতে দোল-উৎসব পর্য্যন্ত করেছেন—এ সকল কথাও শুনতে পেলেন।

বিপিন মায়ের অনুমতি নিয়ে উপার্জ্জন করবার আশায় বিদেশে চলে গেছে—এ সংবাদেও তিনি বিচলিত হলেন না। সে নিজের পায়ে নিজে

দাঁড়াতে শিখ্‌ছে, শুনে তিনি বরং সুখী হলেন। অহেতুক দুশ্চিন্তার তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। বিশেষ তিনি এতটা কাজের ভিতর নিজকে ডুবিয়ে রাখ্‌তেন এবং দিনের শেষে অপরাধ-ভঞ্জন-স্তোত্র পড়ে ভগবানের নিকট এমনই সম্পূর্ণভাবে আত্ম নিবেদন করে দিতেন, যে কোন শোক দুঃখ বেশী করে তার মনের মাঝে বাসা করে থাক্‌তে পার্‌ত না। তথাপি তাঁর অন্তরটি ছিল স্নেহময় মহাসমুদ্রের মতই। তিনি ভাবরাশি নিয়ে স্থির হ'য়ে থাকতেন—সে ভাবের উত্তাল অধীরতা কেউ টের পেত না।

তথাপি ঘুরে ফিরে শতদলের কথা মনে আনাগোনা কর্‌ত। শতদল কষ্ট করে নিজের ব্যয় নিজে সঙ্কুলান কচ্ছে, "হয়ত আমি যেমন খাট্‌ছি, সেও তেমনই খাট্‌ছে—আমার শতদলপদ্ম বুঝি আর তেমন ঢল্‌ঢলে প্রফুল্ল নেই—বোধ্ হয় ম্লান হয়েছে। আর আমার বিরাগী বৈষ্ণব ছেলেটা কি পথে পথে "জয় গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ" বলে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে না কোন মন্দিরে অতিথি সেজে কীর্ত্তন শুনে কাঁদছে"—এই ভেবে তিনি এক এক সময় দুই এক ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌তেন। তার তো খাওয়া দাওয়ার কিছুই জ্ঞান নেই, ক্ষুধা পেলে সে চেয়ে খায় না—এমন ছেলে আমার রোদে তেতে, বৃষ্টিতে ভিজে কোথায় কি কচ্ছে—ভেবে সময়ে সময়ে কষ্ট হ'ত। সুন্দরী ও খুঁকির জন্য এক এক সময় মনে জ্বালা হ'ত। কিন্তু যে অলস, যে সারাদিন শুয়ে ব'সে কাটায়—তাকেই শোকে দুঃখে পেড়ে ফেলে। যোগেশের সেরূপ করবার অবসর কোথায়? সারাদিন খেটে এসে একটা কেদারায় হেলান দিয়ে এসে বসেছেন, অমনি একটি কলেজের পাশ ছেলে এসে তার সঙ্গে দেখা ক'রে বল্লে "মহাশয়, শুনেছি আপনি বেকার সমস্যা সমাধানে আত্মশক্তি নিয়োগ করেছেন, আমায় একটা পথ বাতলে দিন। কত চেষ্টা যে কচ্ছি, কত জায়গায় যে আর্জ্জি কচ্ছি, কোথায়ও তো কিছু জুটল না।' অমনি শতদলকে ভুলে, ছেলে মেয়ে ভুলে,

উৎসাহের সহিত যোগেশবাবু তাকে বুঝতে লেগে গেলেন,—বল্লেন "ও তো পথ নয়, দেখছেন ম'শায় শত শত লোক ঐ কচ্ছে, অথচ দু'তিন বছরেও কিছু পাচ্ছে না, আপনি উত্তর দিকে যেতে চেয়ে দক্ষিণ দিকে পা ফেল্লে কবে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি হবে? দেখছেন ওরকম ক'রে কিছু হচ্ছে না, তবু ঐ আরজিই ছুঁড়বেন।'

ছাত্র। "তবে কি করব?"

যোগেশ। "হিন্দুস্থানী, রাজপুত, কাবুলী, পাঞ্জাবী তারা এসে কি ক'রে?"

ছাত্র। "আমি 'দুই পয়সার তিনটি বিলিতি দেশলাই' বলে সারাদিন পথে পথে চেঁচিয়ে বেড়াব?"

যোগেশ। "তা কল্লেও মন্দ হয় না, আবজি করার চাইতে অনেকটা ভাল, আপনি একটা কাজ করুন না কেন?"

"কি করব বলুন?"

"আপনি কোথায় থাকেন?"

"গ্রে ষ্ট্রীটে"

"আচ্ছা আপনার বাড়ীকে কেন্দ্র করে একমাইল পরিধির একটা ম্যাপ এঁকে ফেলুন, তার মধ্যে কতগুলি গলি আছে, তা লিখুন। সেই সেই গলিতে কে কে বাড়ী বিক্রী করবে, তা নোট বুকে টুকে রাখুন, যারা খরিদদার হ'তে পারেন, কাছে কাছে অর্থাৎ আপনার পরিধি-ধৃত বৃত্তের মধ্যে, তাঁদের নাম টুকুন। রোজ ছয় ঘণ্টা এই কাজ নিয়ে খাটুন, একখানা বাড়ী যদি ২।১ মাসের চেষ্টায় কি ৪।৫ মাসের চেষ্টায়ও বিক্রী করতে পারেন, তবে আপনি এক হাজার টাকা পাবেন, কি তার বেশীও পেতে পারেন। আপনি ২৫।৩০৲ টাকা মাহিয়ানার কাজ খুঁজছেন, এতে আপনার প্রায় এক শত টাকার কাছাকাছি পুষিয়ে যাবে। অর্থাৎ যদি

এ বছরের মধ্যে একখানি মাত্র বাড়ী বিক্রী করতে পারেন। আপনি এইরূপ যদি রোজ রোজ আকাশে ধোঁয়া না উড়িয়ে সত্য সত্যই খাটেন, তবে ভগবানের উপর আপনার একটা দাবী হবে, দেখ্‌বেন তিনি আপনাকে মজুরী দিতে কসুর করবেন না।"

এই ভাবে স্ত্রীপুত্রের চিন্তা চাপা পড়ে যায়। কোন দিন বা কাউকে বলে দেন "বড় বাজারে গিয়ে ২।১ মাস রোজ ঘুরে ঘুরে জিনিষ পত্রের দর জান্‌তে থাকুন, তার পর নিম্নতম দরটি হাতে ক'রে যদি আপনি ছোট ছোট দোকানদারদের বলতে পারেন কত কম দরে আপনি জিনিষ সরবরাহ করতে পারবেন, তা হ'লে আপনার অভিজ্ঞতার ফল দেখ্‌তে পাবেন। দুই পক্ষের মধ্যে কারবার হয়ে যাবে, আপনি কমিসন পাবেন। কাউকে বা বলে দেন "গ্রন্থকারদের বই নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বিক্রি করতে চেষ্টা করুন। তাতে যা কমিসন পাবেন তাতে বেশ পুষিয়ে যাবে। মোট কথা' 'আমি যে কাজ করছি, তাতে সফলতা লাভ করবই কি করব।' এইরূপ নিজের মনের কাছে দৃঢ় অঙ্গীকার করে কাজে হাত দেবেন। লোকভুলানো রূপে ও শিথিল ভাবে কাজ ক'রে শেষে হাত পা ছেড়ে দিয়ে যেন না বলেন "আমি চেষ্টা করেছিলুম, কিছু হ'ল না।"

যোগেশবাবু নিজে কাজের ভিতর আশীর্ষ নিমজ্জিত থেকে পরকে এই ভাবে উপদেশ দিতেন। কিন্তু তিনি জান্‌তেন, বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবক কেবল বাঁধা মাইনে, অলসভাবে চেয়ারে বসে কাজ করার মতন একটা চাকুরী, বিজলী বাতি ও বিজলী পাখার হাওয়া খেয়ে কাজ এই করতে চায়, তা মাইনে যত কমই হউক না কেন। সে নূতন পথ ভাঙ্গবার শক্তি পায় না। বিশ্ববিদ্যালয় তার উদ্যমের উপর পাথর সমান মেহানত চাপা দিয়ে দুই হাটু ভেঙ্গে রেখে দিয়েছে—সে আর কোন পরিশ্রমের যোগ্য নাই।

এখন যে শুভ দিনটা ঠিক হয়েছে। তাতে আর একমাস পরে তাকে

পরিবার শুদ্ধ আদর্শ-পল্লীতে যেতে হবে। এখন তিনি কি করবেন, কোন মুখে বলবেন, তাঁর পরিবার নাই। কি ব'লে শতদলকে চিঠি লিখবেন, সে যে চিঠি লিখতে মানা করেছে। তার যদি দয়া থাকত, তবে তো সে একখানি চিঠি তাকে লিখতে পারত। সে তো তাকে একবার অগ্রাহ্য করেছে, কোন্ মুখে তাকে চিঠি লিখবেন। ভাবনায় মুখ শুকিয়ে গেল। কতবার চিঠি লিখতে গিয়ে কি লিখবেন একটি শব্দও ভেবে পান নাই। কলম ধরে বসে বসে কেঁদেছেন।

তার পর একদিন ভগবানের নাম জপ করে, এই কয়টি ছত্র ভরসা করে লিখে ডাকে ফেলে তেনাই গ্রামের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেন।

"শতদল আমার শত দোষ মাপ করবে, আমি আর তোমাদের ছাড়া থাকতে পাচ্ছি না, বড় কষ্ট হচ্ছে। তুমি সুন্দরী ও খুকীকে নিয়ে পত্র পাঠ চলে আসবে। ৭ই আষাঢ় আমার কলিকাতা ছেড়ে যেতে হবে—তার পূর্ব্বে এস। বিপিনের কোন খবর পেয়েছ? লক্ষ্মীটী আমার উপর আর অভিমান কোর না।

তোমার হতভাগ্য স্বামী

অশ্রুপূর্ণ চোখে চিঠিখানি ডাক বাক্সে ফেলে দিয়ে এসে যোগেশবাবু নিজ বিছানায় বালিসের উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন।

২১

আজ তেনাই গ্রামে শতদল কার মুখ দেখে উঠেছিলেন। ডাক পিয়ন দুইখানি পত্র নিয়ে কি মধুর কণ্ঠে ডেকে—এ কি দেব-দুর্ল্লভ জিনিষ দিয়ে গেল! শতদল সবে প্রত্যূষে উঠে ঘর নিকিয়ে বিছানা তু'লতে ছিলেন। খুকী এখনও ঘুমিয়ে আছে, তার এখন পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে। কি সুন্দর একরাশ বেল ফুলের মত হাত পা ছড়িয়ে সে বিছানায় পড়ে আছে।

শতদল একবার তার মুখখানি দেখে নিলেন, তখন বনলক্ষ্মীর মত এলো-চুলে মূর্ত্তিমতী স্ফূর্ত্তির ন্যায় সুন্দরী এসে "মা, এই নাও তোমার শিব পূজার ফুল" বলে সাজি থেকে কতকগুলি সদ্যফোটা জবা, কুন্দ ও টগর একখানি পিতলের থালে ঢেলে রাখলে।

এই সময় "মা ঠাকরুণ, পত্র নিন্" ব'লে ডাক পিয়ন দুইখানি পত্র দিয়ে গেল। শতদল দুই খানা পত্র মাথায় ঠেকিয়া পিয়নকে বল্লেন, "দাঁড়া, দেখি বাছা।" আঁচল থেকে চাবির রিংএর মধ্যে ছোট একটি চাবি বের ক'রে হাতবাক্স খুলে একটি টাকা পিয়নকে বক্‌সিস দিলেন এবং একটা হাড়ীর থেকে দুইখানি সন্দেশ সেই সঙ্গে দিয়ে বল্লেন "আমি দুঃখিনী, বাছা তোকে কি দেব—আমার এই সামান্য দান নিয়ে যা।"

পিয়ন বুঝ্‌ল বুঝি এর স্বামীর চিঠি এসেছে। কারু কাছে এঁদের কথা অবিদিত ছিল না, সে খুসী হয়ে চলে গেল।

দুইখানি চিঠি, একখানি তাঁর স্বামীর চির-পরিচিত অক্ষরে, আর একখানি তাঁর প্রাণাধিক পুত্র বিপিনের। চিঠি তখনও খোলেন নি, কিন্তু তারা নিশ্চয়ই ভাল আছেন। লেখার মধ্যে কোন ক্লান্তির চিহ্ন নাই। বিপিনের হাতের আখর মুক্তোর মত। শতদলের মনে পড়ল, প্রথম যৌবনে যোগেশবাবুর হাতের লেখাও তেমনই সুন্দর ছিল—সেই হাতের লেখা দেখে জন্‌সন্ সাহেব তাঁকে চাকুরী দিয়েছিলেন—এখন লেখা টানা হয়ে গেছে, তা' পাকা ও স্বচ্ছন্দ-গতি, বিপিনের লেখা একটু দূর থেকে দেখলে ছাপার লেখা বলে ভুল হয়, কিন্তু যোগেশবাবুর লেখা যেন নদীর মধ্যে জেলে ডিঙ্গির মত, কাগজের মধ্যে দাগ কেটে এঁকে বেঁকে সহজ গতিতে চলে গেছে।

এ যে একান্ত অপ্রত্যাশিত, এক সঙ্গে দুই চিঠি। এই দুই বৎসরের মধ্যে যে বিপিনের কোন খবরই তিনি পান নাই। কত লোকের কাছে

পারলুম না। সুরেশকে (আমার বন্ধু) বলেছিলুম, এক হপ্তা সে এখানে থেকে কাজকর্ম্ম দেখে, তা যদিও তার পরীক্ষা হয়ে গেছে—সে বল্‌ছে মধুপুর বেড়াতে যাবে। আর সংসার চালাতে ভাবতে হবে না যাঁর সংসার তিনি তার ভার নিয়েছেন—আমাদের যা' কিছু তাঁর নামে লিখে দিয়ে খালাস হয়েছি। মা এখানে এসে তুমি আমার হাতে গড়া মূর্ত্তিগুলি দেখবে, কত রাজ্যের লোক দেখে প্রশংসা করে, তুমি যে পর্য্যন্ত না দেখবে, সে পর্য্যন্ত আমার কি তৃপ্তি হ'তে পারবে? খুকী তো এখানে এসে আনন্দে লাফাবে, এবং সুন্দরীও বেণী দোলাতে দোলাতে কত ফুল যে তুল্‌তে পার্‌বে, তার ঠিকানা নাই। খুকীকে আমি সংকীর্ত্তনে মন্দিরা বাজাতে দেব।

মা, আমি তোমার ঘরের বাহির-হওয়া ছেলে,

বিপিন।"

তার পর স্বামীর পত্র পেলেন। খানিক পরে রাস্তার খরচ বাবদ দুই শত টাকার মণিঅর্ডার পেলেন, একশ পাঠিয়েছেন স্বামী আর একশ পাঠিয়েছে বিপিন। তাঁর নিজ হাতে তখন ৬৫০ টাকা জমেছিল।

পত্রপাঠ, তিনি বিপিনকে তার করলেন, তুমি শীঘ্র তেনাই চলে আসবে। তোমার পিতা কলিকাতা থেকে চিঠি লিখেছেন—আমাদের সেখানে যেতে হবে, তুমি এলে একত্র যাব।"

বিপিন 'তার' পেয়ে সুরেশকে তা দেখাল। রমা দেবী বল্লেন, "সুরেশ তোমার আর মধুপুরে যাওয়া হয় না। রথের সময় কুঞ্জের ভার তোমাকে নিতে হবে। নতুবা সব টাকা চুরি হয়ে যাবে। সুরেশ অগত্যা কবুল হ'ল, সুহাসিনী বল্লে "আমি দাদার সঙ্গে এ কয়টি দিন কুঞ্জে থাকব।"

রমেশ বাবু সকল ব্যবস্থা করে দিলেন। যেদিন বিপিন যাবে সেদিন

সুরেশ বল্লে "আমার ক্লাসের ছেলেরা আমাকে ঠাট্টা কচ্ছিল, তারা বলছিল—বিপিনটা একটা ভণ্ড, জোচ্চুরি করে লোক ঠকিয়ে—তাদের কুসংস্কারের সুবিধা নিয়ে টাকা রোজগার কচ্ছে, তোকেও দেখ্‌ছি, এই জুয়োচুরির ভিতর টানলে ?"

বিপিন হেসে হেসে বল্লে—"মক্কেলের টাকা পকেটে গুজে অন্য মোকর্দ্দমায় চলে গিয়া কি কোন উকিল সে টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন ? ডেপুটি মুন্সেক হয়ে কত লোককে ভুলে জেলে পাঠানো, এক জনের জমি অপরকে দেওয়া এই সব চল্‌ছে। ছেলেদের তো এইরূপ চাকুরী আদর্শ, আর ভগবানকে ডেকে ডেকে তার দুয়ারের প্রসাদ খাওয়া, লোককে তাঁর রূপ দেখান, তাঁর কথা শুনান—এই সকল হচ্ছে জুয়োচুরি। তুমি যদি এই কাজ জুয়োচুরী ব'লে মনে কর সুরেশ দা, তবে তোমার উপর কুঞ্জের ভার দেওয়া আমার পক্ষে পাপ।"

সুরেশ বিপিনের পিঠে একটা চাপড় মেরে বল্লে—"আমি বুঝি জুয়োচুরি মনে করেছি রে বোকা, আমি তাদের বেশ করে কথা শুনিয়ে দিয়েছি। যারা তোঁর বিরুদ্ধ ছিল, তারা হটে গেছে। তুই কি বলিস, তোর মন বুঝ্‌তে এই সকল কথার উল্লেখ করলুম। তোর ঠাকুরের পাদ-পদ্ম স্মরণ ক'রে যে রোজ আমি ঘুমুতে যাই।"

সুরেশকে কুঞ্জের ভার বুঝিয়ে দিয়ে বিপিনের তেনাই আস্‌তে কতকটা দেরি হয়ে গেল। ৭ই আষাঢ় যোগেশবাবু কলকাতা ছাড়বেন বলে লিখেছিলেন, আজ ২রা আষাঢ় বিপিন তেনাই এসে পৌঁছিল।

যোগেশ বাবু হিসাব করে দেখেছিলেন, যদি শতদল পত্রপাঠ রওনা হন, তবে ২৬শে জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় এসে পৌছবেন। ২৬শে গেল, ২৭শে গেল—৩১শে জ্যেষ্ঠ পর্য্যন্ত কোন চিঠি পাওয়া গেল না। শতদল বিপিন আস্‌বে বলে অপেক্ষা কচ্ছিলেন, সে এলেই চলে যাবেন, এই স্থির ছিল—এজন্য পত্র লেখা হয় নাই। কিন্তু একদিন একদিন করে দিন পিছুতে লাগ্‌ল দেখে তিনি অধীর হ'য়ে পড়লেন।

যোগেশ বাবু ভাবলেন—শতদলের অভিমান ভাঙ্গে নি। ওঃ সে কি কষ্ট! এবার যে আর কষ্ট সহ্য হচ্ছে না। হাতুড়ীর ঘায় যেন তাঁর বুকটা ভেঙ্গে যেতে লাগল। মনিঅর্ডারের গতিবিধি একটু বিলম্বিত, সুতরাং তা ফিরে আস্‌তে একটু দেরি হবে। সেবারও পত্র পাওয়ায় দুই দিন পরে তা ফিরে আসছিল। মণিঅর্ডার ফিরে আসবে, ভাব্‌তে তার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছিল। দাম্পত্য-প্রেমের কি অদ্ভুত শক্তি! এই যে প্রায় তিনটি বছর কেটে গেছে, এর মধ্যে তো ভুলবার কত চেষ্টা করেছেন, কিন্তু শতদল নামটি শুনলে যে চোখ দুটিতে কে অশ্রুর উৎসব বহিয়ে দেয়! এই অশ্রু শিশিরের মতই কি স্বর্গ হ'তে আসে? এই চার পাঁচ দিন যোগেশ বাবু ঘুমুতে পারেন নি, কতবার স্বপ্নঘোরে মনে হয়েছে, শতদলের কালো দীর্ঘ বেণীটা দুল্‌তে দুল্‌তে তার গা ছুঁয়েছে, অমনই নিজের ভুল বুঝতে পেরে ঝর ঝর করে দুধারে চোখের জল পড়েছে। শতদল, তুমি না জান্‌তে তোমার স্বামী কাঁদতে জানে না। একবার দেখে যাও। কখন মনে হচ্ছে, পদ্মের কুঁড়িগুলির সামনে যেমন একটা ডাগর পদ্ম ফুটে থাকে, তেমনি ছেলেটি ও মেয়ে দুটি সম্মুখে করে শতদল তাঁর কাছে বসে আছে! স্বপ্নে তাঁর স্বরটাও যেন শুন্‌তে পেতেন। ওঃ সে কি বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর,!

সে কোকিল কুজন তিনি আর কবে শুনবেন? একদিন হুকা হাতে তামাক টানছেন, মনে হ'ল যেন কার কোমল পাদক্ষেপ শোনা যাচ্ছে, সেই পাদ-ক্ষেপের শব্দ কর্ণের অমৃত, তার দেহের সুগন্ধ বাতাসে বহে আন্‌ছে। যোগেশবাবু হুকা হাতে বসে আছেন, তামাক খাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে একটা ছবির মত এক ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন।

যখন আশাতরী ডুবুডুবু—আর শতদল আসবেন না—যখন বুকের পাঁজরাটা ভেঙ্গে যাচ্ছিল, সেইরূপ এক মুহূর্ত্তে ৪ঠা আষাঢ় রবিবার সন্ধ্যায় আনন্দ কলরবে তার গৃহ ঝঙ্কৃত ক'রে, ছেলেমেয়েদের কাকলীতে কর্ণ পরিতৃপ্ত করে ঝড়ো হাওয়ার মত শতদল এসে স্বামীর পায়ে পড়লেন, অনেকক্ষণ কেউ কথা বল্‌তে পারলেন না। শতদলের আলুলায়িত লম্বিত কেশ পাশ যোগেশের পা জড়িয়ে ধরলে, অবিরত চোখের জল পড়ে পড়ে তাঁর পা দুখানি ভিজে গেল, কিছুতেই যোগেশ তাকে তুলতে পারলেন না। সে স্বামীর পায়ের নীচে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, তিনি কোন্ মুখে স্বামীর চোখের দিকে চাইবেন, যদি চাইতে পারতেন তবে দেখ্‌তেন, তার দেবতুল্য স্বামীর গণ্ড বাহিয়া অজস্র অশ্রুর বাণ ছুটেছে। নীচে ভোগবতীর প্রবাহ—উপরে স্বর্গের অলকনন্দা। আর মাঝে তিনটি ছেলেমেয়ের চোখে গঙ্গা উথ্‌লে উথ্‌লে উঠ্‌ছে।

২২

যে চ'লে গেছে, এমন স্বামী ছেড়ে যে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে একটা বাহিরের লোকের সঙ্গে চলে গেছে, তার জন্য প্রাণ কেঁদে উঠে কেন? পরের দুঃখ তো রাজীব চৌধুরী হেসে উড়িয়েছেন; পয়সার লোভের নিকট তো তাঁর অন্য সমস্ত বৃত্তি মাথা হেঁট করেছে। নিজেই অকারণে ভগবানের নিকট হ'তে এরূপ একটা শাস্তি পেয়েছেন; সুতরাং অপরে বিপদে পড়লে

তিনি তো মনে মনে খুসী হয়ে থাকেন। দিদি চলে যাওয়ার পর মনটা আরও উতালা হয়ে উঠল। কোন কোন সময়ে, সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য বিপিনের পড়া বন্ধ ক'রে ফেলেছেন, ভাবতে তাঁর মনে অনুতাপ উদিত হওয়ার উপক্রম হত, কিন্তু আকাশের মেঘ কেটে চন্দ্রের একটি ক্ষীণ রেখা দেখা দেওয়া মাত্র পুনরায় তাহা মেঘের কবলিত হাওয়ার মত সেই অনুতাপ অস্থায়ী হইত। বিপিন তো দেখতে এত সুন্দর, এরূপ বিনয়ী, কোন দিন চোখের দিকে চেয়ে কথা বল্‌ত না, এরূপ ভাল ছেলেটার পড়া বন্ধ করে কি ভাল করেছি? এইরূপ ভাবনায় যে সময় মনটা একটু দুঃখিত হবে পড়বে, এমনই সময় শুনতে পেলেন, তাঁর দিদি তেনাইয়ের বাজারে লোক মারফৎ শাক-সব্জী বিক্রী করছেন এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের লোক তাঁর ভাইয়ের নিন্দাবাদ কচ্ছে। তখন অনুতাপ জোয়ারের গাঙ্গে তৃণের মত ভেসে যেত ,—ভীষণ দুষ্ট সাপের মত রাগ তাঁর মনে ফোঁস্ ফোঁস্ করে উঠ্‌ত।

কিন্তু লবঙ্গের স্মৃতি মুছে ফেলা তার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠল। এখন প্রায়ই মনে হ'তে লাগল, স্নেহময়ের খাওয়ার সময়,—লবঙ্গ কপাটের আড়াল থেকে সতৃষ্ণ ভাবে চেয়ে থাকৃতো, এবং বামুন ঠাকুরকে তার খাওয়ার সম্বন্ধে চুপে চুপে বিশেষ ক'রে উপদেশ দিত। একদিন রাজীব চৌধুরী দেখ্‌লেন, স্নেহময় ও লবঙ্গ দুইজনে এক নিরালা জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বল্‌ছেন, এবং লবঙ্গ চোখের জল মোছবার মতন আঁচল উঁচুতে উঠিয়ে কি কচ্ছেন, দূর হ'তে তিনি ভাল ক'রে দেখ্‌তে পান নি—তথাপি তার আভাসে একটু সন্দেহ হয়েছিল, যে লবঙ্গ কাঁদছেন। তাঁর আর চার জন বন্ধুর সঙ্গেও তিনি তাঁকে কথা বলতে বাধ্য করেছিলেন, কিন্তু লবঙ্গ যে স্নেহময়ের প্রতিই বিশেষ ভাবে অনুরক্ত ছিলেন, এখন দিনরাত সেই ছোট খাট কথা মনে পড়ত। তাঁর পিতা তো এক সময়ে স্নেহময় এবং লবঙ্গকে ডেকে নির্জ্জন ঘরে তাদের সঙ্গে কথা কয়েছেন, অপর বন্ধুদের বেলা তো তিনি

সেরূপ করেন নাই। তাঁরই প্রশ্রয়ে বোধ হয় তারা এতটা মিশবার সুযোগ পেয়েছিল।

তিনি যে লবঙ্গের পালাবার জন্য কতকটা দায়ী নন, এ কথা মনকে হাজার চোখ ঠেরেও কিছুতেই বুঝুতে পারতেন না। বন্ধুদের সঙ্গে মিশবার জন্য পীড়াপীড়ি করার সময় তো তাঁর কখনই মনে হ'ত না, যে এমন একটা ঘটনা ঘট্‌তে পারে; সত্য সত্যই যে এরূপ ঘটনা ঘট্‌লে মন কিরূপ ভেঙ্গে যায়, তা তো তাঁর খেয়ালই ছিল না,—এ কি ভয়ঙ্কর কষ্ট—কি সহস্রবৃশ্চিক দংশন! সে দুষ্টার জন্য এখনও মনের ভিতর থেকে কে কেঁদে উঠে? যে কেঁদে উঠে সে যে অপগণ্ড শিশুর মত, মোটেই দুর্দ্দান্ত রাজীব চৌধুরীর মত নয়। রাজীব চৌধুরী চোখ রাঙ্গিয়ে সেই ক্রন্দনশীল জীবটাকে দমিয়ে রাখতে চান, কিছুতেই তা পারেন না। সে মনের ভিতর থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেন্দে উঠে, একবারে হাত পা ছেড়ে দিয়ে নিঃসহায় শিশুর মত কাঁদতে থাকে। সেই দুষ্টা স্ত্রী, যার বাতাস অগ্নিকণার মত হবে, তার স্মৃতি এমন স্নিগ্ধ এমন শীতল হ'ল কি ক'রে?"

এক এক সময়ে মনে হয়, "কেন নিজের ঘরে নিজে আগুন জ্বালালুম? কেন চারটা লোক ডেকে এনে ঘরে এই নিদারুণ অশান্তির সৃষ্টি করলুম? বিয়েব প্রস্তাব বিষের মত মনে হয়, "লবঙ্গকে ছেড়ে অপর কাউকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করব? তাও কি হয়?" তখন রাজীব বাবু আফিস ঘরে গিয়ে নথি পত্র নিয়ে ডুবে থাকতেন—কিন্তু কোথায় দিন গেলে দুঃখের ভার লঘু হবে, শোক কমে যাবে, না আরও বেড়ে যাচ্ছে! কি প্রগাঢ় স্নেহ দেখিয়ে লবঙ্গ আমার মনকে বেঁধে ফেলেছে, দিনে দিনে যেরূপ কোন পিশাচী লতা দীর্ঘ তরুকে ভুজঙ্গ বেষ্টনে বেঁধে তার জীবনী শক্তি নষ্ট করে, সেই দুষ্টা স্ত্রীর স্মৃতি তাঁকে তেমনই জীর্ণ করতে লাগল।

এই ভাবে তিনটি বৎসর চলে গেছে। একটা অভ্যাসের বশীভূত হয়ে

রাজীব চৌধুরী কাজ কর্ম্ম করেন, প্রজা-পীড়ন করেন—তাদের রক্ত শোষণ ক'রে ভিটামাটি উৎসন্ন করে খাজনা আদায় করেন, মিথ্যা মোকদ্দমা করে তাদের জব্দ করেন। যে টাকার সুদ জমা দিয়েছে তার সুদ অল্প করে উসুল দিয়ে, মিথ্যামিথ্যি ঋণের দাবী বাড়িয়ে ফেলেন। মানুষ যা চিরকাল ক'রে এসেছে—তার হাত এড়ান মুস্কিল। এই সকল অন্যায় করতে তাঁর প্রাণে বাজে না—দীর্ঘকালের অভ্যাস বশতঃ এই সব কাজ তার গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু এইরূপ ভাবে অর্থ-বৃদ্ধির চেষ্টার মধ্যেও তাঁর আর প্রাণ নাই। আমরা যেরূপ রোজ মাছ খাই—তার মধ্যে যে কতখানি নিষ্ঠুরতা আছে—তা বুঝতে পারি না—রাজীব চৌধুরীও অভ্যাস বশতঃ সেই ভাবে তার নিত্য কর্ম্ম ক'রে যেতেন।

এখন হঠাৎ মাঝে মাঝে সুদ মাপ দিয়ে ফেল্‌তেন। যাহাদিগকে প্রজা-পীড়নে নিযুক্ত রেখেছিলেন, তাদের অত্যাচার কাহিনী শুনে হঠাৎ বিরক্ত হতেন। একদিন রেগে গিয়ে এজন্য একজন সরকারকে ডিস্‌মিস করে ফেল্লেন। বাবুর এই ব্যবহারে ম্যানেজার শুদ্ধ সকলে চমৎকৃত হয়ে গেলেন। হঠাৎ একদিন ঠাকুর বাড়ীতে গিয়ে প্রণাম করে এলেন, এমন কি এক দিন তার পিতার পূজার ঘরে ঢুকে তাঁর পরিত্যক্ত খড়ম জোড়া হাতে নিয়ে তাতে মাথা ঠেকালেন।

একি মতিভ্রম! লবঙ্গ আর তিনি যে ঘরে শুতেন, সেই ঘর চবের তালা চাবি দিয়ে বন্ধ করে ফেল্লেন, কেউ যেন আর সে ঘরের দোর না খোলে। মনটা যেন দিনরাত কাকে খুঁজতে থাকত, কার কাছে যেন দিন রাত বল্‌তে ইচ্ছা হ'ত, "ফিরিয়ে দাও, আর পারছি না, কি ভাল কি মন্দ বুঝতে পাচ্ছি না, ফিরিয়ে দাও, বুকটা যে কিছুতেই ঠাণ্ডা হচ্ছে না।

রাজীব চৌধুরীর স্বভাবটা পর্য্যন্ত যখন এই ভাবে ভালর দিকে বিগড়ে যেতে লাগল, তখন একদিন আর সহ্য করতে না পেরে তিনি হঠাৎ বৃন্দাবন

রওনা হয়ে চল্লেন। "আর কিছু নয় বাবার পায় ধ'রে কাঁদব, কুসন্তান তাঁর পিতামাতাকে কত কষ্ট দিয়েছে, তাই বাবার পায়ে পড়ে জানাব। তা হ'লে হয়ত একটু শান্তি পাব। বাবার মুখখানি দেখ্‌লে বোধ হয় আমার প্রাণে শান্তি আস্‌বে। এ যে দাবানল জ্বলছে।"

বৃন্দাবনে এসে শ্যামকুণ্ডের ধারে তাঁদের মস্ত বাড়ীর দোরে দেখেন স্নেহময় দাঁড়িয়ে। রাগে তার সর্ব্ব শরীর জ্বলতে লাগল, ইচ্ছা হল বাঘের মত ঝাঁপিয়ে তার পিঠে পড়ে তার ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খান।

ক্রুদ্ধ নেত্রে তার দিকে তাকাতে সে খিল খিল ক'রে হেসে ফেলে বল্লে, "আর রাগ্‌তে হ'বে না, আমি লবঙ্গের দাদা,—আমার নাম স্নেহময় নয়,—চারুচন্দ্র। নিরুদ্দেশ ছিলুম। বোনটির মাথা খাবার চেষ্টা কচ্ছিলেন, দেখে তাঐ ম'শায় আমাকে 'তার' করে রঘুপুরে এনেছিলেন। নিজে বৃন্দাবনে এসে আমাদের এখানে গোপনে আসবার পরামর্শ দিয়ে এসেছিলেন, তাই লুকিয়ে এনেছি। আপনার কাছ থেকে লবঙ্গকে তো আর ব'লে ক'য়ে আনবার যো ছিল না, তা হ'লে তো আপনি সৃষ্টি তোলপাড় করতেন। লবঙ্গ এখানেই আছে—দিন রাত তাঐ ম'শায়ের সেবায় লেগেই আছে। আর নির্জ্জনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে, কখনও আঁচল দিয়ে কেবলই চোখ মুছ্‌ছে। তাঐম'শায়ের কাছে আপনি মাঝে মাঝে যে পত্র লিখেন, তা যক্ষের ধনের মত আঁচলে বেঁধে রাখে—আমি কিন্তু টের পাই, কয়েক দিন পরে দৈবাৎ সেই চিঠি হাতে পড়লে দেখতে পাই, তার চোখের জল আখর গুলি ধুয়ে মুছে গেছে।"

বড় যোদ্ধাকে যেন কেউ একবারে নিরস্ত্র করে ফেল্লে। পুরু রাজা যেন আলেকজেণ্ডারের কাছে হাত পা শিকলে বাঁধা পড়ে উপস্থিত হলেন, স্নেহময়ের কাছে দুরন্ত রাজীব চৌধুরী আজ সেইরূপ স্নেহের বন্দী হলেন।

পাঠকের মনে থাকতে পারে পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে লিখিত হয়েছে যে নবঙ্গের পিতা শিবচন্দ্র মজুমদারের জমিদারীর আয় ছিল বৎসর বার হাজার টাকা। তাহা ছাড়া আর একটা জমিদারীর ওয়ারীস তার পুত্র চারুচন্দ্র হয়েছিল। তার আয় আট হাজার। এই জমিদারিটা চারুর নিঃসন্তান বিধবা মাসী প্রসন্নময়ী দেবী উইল করে তাঁকে লিখে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে উল্লিখিত ছিল, যদি চারু জীবিত না থাকে, তবে সেই বিধবার স্বামীর জ্ঞাতি ভ্রাতস্পুত্রেরা তাহা পাইবেন। এই উইল করেই প্রসন্নময়ী মারা যান, তার পরে সেই জ্ঞাতিরা বিশেষ করে নানা উপায়ে চারুর প্রাণ নষ্ট করতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। শিবু মজুমদারের বিশ্বস্ত ভৃত্য বৃদ্ধ শ্যামাদাসের চেষ্টায় দুইবার বিষ প্রয়োগের চেষ্টা বিফল হয়। শিবু মজুমদার দেখ্‌লেন, তিনি বুড় হয়েছেন, মাতৃহীন শিশু তাঁর অভাবে ইহাদের হাতে গিয়ে পড়লে তার প্রাণ রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তখন তার বৈবাহিক রজনী চৌধুরীর সঙ্গে অনেক পরামর্শ করে, আলিপুর কোর্টে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তথাকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল কালীচরণ রায় এবং রজনী চৌধুরীকে সাক্ষী রেখে এফিডেভিট করে বার বছরের বালক চারুচন্দ্রকে সোনাক্ত করেন। তার আঙ্গুলের ছাপ এবং ফটোগ্রাফ সেই এফিডেভিটের সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসে রাখা হয়।

প্রসন্নময়ী দেবী শিবু মজুমদারকে সম্পত্তি হেবাতে রাখবার জন্ত অছি নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। উইলে ইহাও লিখিত হয়েছিল যে যদি শিবু মজুমদার চারুচন্দ্রের সাবালকত্বে পৌছবার পূর্ব্বে অক্ষম ও পীড়িত হয়ে পড়েন তবে তিনি যাঁকে ইচ্ছা তাঁকে তাঁর স্থলে এ সম্পত্তির

অছি নিযুক্ত করতে পারবেন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে শিবু মজুমদার রজনী চৌধুরীকে তৎস্থলে নিযুক্ত করেন।

এদিকে বার বছরের বালক চারুচন্দ্রকে মজুমদার মহাশয় ইচ্ছা করে নিরুদ্দিষ্ট করিয়া ফেলেন। সে কালীচরণ রায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বোর্ডিং থেকে পড়াশুনা করৃত, এবং তাঁহার পিতা তাকে মাঝে মাঝে দেখে আস্‌তেন। তাঁর নাম বদলিয়ে অপর নাম দেওয়া হয়েছিল, এবং এই ঘটনা শিবু মজুমদার, রজনী চৌধুরী ও কালীনাথ রায় ছাড়া আর কেউ জান্‌তেন না। শেষে রজনী চৌধুরী বৃন্দাবন যাওয়ার পূর্ব্বে লবঙ্গকে বলেছিলেন।

সাত বছর পর্য্যন্ত জ্ঞাতিরা আইন অনুসারে কিছু কর্‌তে পারে নাই। ছেলের বয়স যখন বিশ বছর হয়েছিল, তখন তারা সে মরে গেছে, এই রকমের মিথ্যা প্রমাণ উপস্থিত ক'রে সম্পত্তির জন্য নালিস করে—তখন শিবু মজুমদার মারা গিয়েছিলেন। রজনী চৌধুরী ও কালীনাথ রায় সমস্ত প্রমাণ ঠিক রেখেও দুই একটি বছর নানা ওজুহতে মোকদ্দমা মুলতবী রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য বাইশ বছরে যখন চারু পূর্ণমাত্রায় সাবালগ হবে, তখন তাকে উপস্থিত করে সম্পত্তি কোর্ট থেকে তার হাতে দিয়ে দিবেন।

চারুর সম্পত্তি পাওয়ার আর মাস তিনেক মাত্র বাকী ছিল। এই সময়ে বৃন্দাবনে হঠাৎ শ্যালক ভগ্নিপতির পূর্ব্বোক্তরূপ দেখা শোনা হয়েছিল।

লবঙ্গ ও রাজীবের মিলন যে কত মধুর হইয়াছিল তাহা বলিবার নহে, তারা যখন প্রগাঢ় দাম্পত্য অনুভব ক'রে রজনী চৌধুরীর পায়ে প'ড়ে প্রণাম করলেন, তখন তাঁর মনে হল, ইনি এবার তাদের সত্যিকার ভাবে ফিরে পেয়েছেন, মনের সঙ্গে মন মিলিত হয়ে গেল। তাদের উদ্দেশ্য, মতামত সব এক হ'য়ে পড়্‌ল—আর তিল মাত্র ব্যবধান রইল না।

রাজীব স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করলেন "লঙ্গ, তুমি আর কতদিন এমন ক'রে আমাকে ছেড়ে থাকতে পারতে ?"

লবঙ্গ। "আর পারতুম না, বাবাকে তাগিদ দিচ্ছিলুম, তিনি শীঘ্রই আমাকে আর চারুকে নিয়ে রঘুপুরে রওনা হবেন—এটি স্থির হয়েছিল।"

২৪

আজ আদর্শ-পল্লীর গৃহ-প্রবেশ। সহর অঞ্চল হ'তে বহু লোকের আমদানী হয়েছে।

তারা তো দেখে শুনে অবাক্। দীঘিগুলি ধারে ধারে কত মল্লিকা-মালতী-রঙ্গণ ও বেলফুলের ঝাড়—চারিদিকে সুপ্রশস্ত লাল রাস্তা—ধারে ধারে এক এক বিঘার উপর ছোট ছোট ইটের গাঁথুনী বাঙ্গলার ছোট ছোট বাগান,—স্কুল, পাঠশালা বাজার, কি সুন্দর ভ্রমণের স্থান এবং ছেলে মেয়েদের খেলবার স্থান। একটি মন্দির তার শুভ্র চুড়া নিয়ে আকাশের দিকে ইঙ্গিত কচ্ছে। পল্লীখানি ছোট্ট একটি নন্দন-কানন। যে সেই পল্লীতে প্রবেশ কর্‌লে, তারই মনে হ'ল এখানে বাস করে প্রাণ জুড়াই।

বেলা ৩টার সময় সঙ্ঘের বৈঠক ব'সে গেল।

বি, সি, ভট্টাচার্য্য সভাপতি।

প্রথমেই তিনি ভগবানের নাম ক'রে সভার কার্য্য আরম্ভ কর্লেন।

যোগেশবাবু বেশ গান করতে পারতেন। তিনি সাত আটটি মেয়েকে একটি গান শিখিয়েছিলেন, তার মধ্যে সুন্দরী ও খুকী ছিল, তারা তিন চার দিনে গানটা আয়ত্ত করে ফেলেছিল। দশ বারটি কুমারী এক সুরে সেঁতার বাজাতে লাগলেন। সেই দশ বারটি সেঁতারের সুর—বহু ভ্রমর গুঞ্জনের মত শোনাতে লাগল। সেই গুঞ্জন ছাপিয়ে উঠল যোগেশবাবুর

কণ্ঠস্বর, সেই গুঞ্জনের সঙ্গে মিশে গেল সাত আটটি কচি মেয়ের তরুণ কণ্ঠ। গানটি এই।

"তোদের দেশের ধান, আর তোদের দেশের পাট
বিদেশে চালান দিয়ে হচ্ছে তারা লাট।
তোরা কিসের কাঙ্গাল, কিসের কাঙ্গাল?"

"তোদের ভাণ্ডার খুঁজতে এসেছে জার্ম্মাণ ইংরাজ
ঝাঁক বেঁধে এসেছে ওই জাপান ওলন্দাজ।
তোরা কিসের কাঙ্গাল কিসের কাঙ্গাল?"

"তোদের ভাণ্ডারের খোঁজে এসেছে শিখ্ মাড়োয়ার
গুজরাটী যত বেনে; কাবুল কাণ্ডাহার।
তোরা কিসের কাঙ্গাল কিসের কাঙ্গাল?"

"তোদের লক্ষ্মী বিলুচ্ছেন ধন, জগৎ হচ্ছে ধনী
বুঝিলিনি তোরা আজও অবোধ তোদের রত্ন-খনি।
তোরা কিসের কাঙ্গাল কিসের কাঙ্গাল?"

"জগতের যত জাতি তোদের মায়ের দোরে,
পরের কাছে মাথা খুড়্ছিস—যা না মায়ের ক্রোড়ে।
তোরা কিসের কাঙ্গাল কিসের কাঙ্গাল?"

"তোদের চাষার বোনা পাটে তোদের সোণার ক্ষেতে
মিল উঠছে, টাকা লুঠ্ছে বাহিরের ছত্রিশ জেতে।
তোরা কিসের কাঙ্গাল কিসের কাঙ্গাল?"

"তোদের টাকায় জীবন-বীমার উঠছে দৈত্য-বাড়ী
তোদের টাকায় বিদেশী বেনে হাঁকাচ্ছে মটর গাড়ী।
তোরা কিসের কাঙ্গাল কিসের কাঙ্গাল?"

"ইচ্ছা ক'রে সেজেছিস্ গাধা বইতে পরের মাল
পরের চিঠি নকল ক'রে কাটাবি চিরকাল!
তোরা কিসের কাঙ্গাল কিসের কাঙ্গাল?"

"কোন দেশে হয় এমন আম এমন আনারস
কোন দেশের শাক্-সব্জী এমন সুরস!
তোরা কিসের কাঙ্গাল কিসের কাঙ্গাল?"

"কোন দেশের ক্ষেত হয় এমন শ্যামল
বিনা কড়িতে পাওয়া যায় এমন মেঘের জল!
তোরা কিসের কাঙ্গাল কিসের কাঙ্গাল?"

"কোন্ দেশেতে এমন পদ্মা এমন ধলেশ্বরী!
কোন দেশেতে এমন ছোটে বাণিজ্যের তরী!
তোরা কিসের কাঙ্গাল কিসের কাঙ্গাল?"

"ওরে আমার চাষা ভাইরে লাঙ্গল লওরে হাতে
ওরে আমার প্রাণের মাঝি পাল খাটাও বাতে।
তোরা কিসের কাঙ্গাল কিসের কাঙ্গাল?"

"ওরে আমার সোনার ব্যাপারী ধান চা'ল তোল না'য়
ডালি দিও না এমন ধন যার তার পায়।
তোরা কিসের কাঙ্গাল কিসের কাঙ্গাল?"

"ঘরে আয়রে কেরাণী ভাই, কি হ'বে কলম পিষে
পরের চাকায় তেল দিলে টাকা হবে কিসে।
তোরা কিসের কাঙ্গাল কিসের কাঙ্গাল?"

"বাড়ী ফের প্রাণের ভাই, মা বলিয়া ডা'ক
নিজের ভাণ্ডার বুঝে নিয়ে আগ্‌লে ধ'রে রাখ।
তোরা কিসের কাঙ্গাল কিসের কাঙ্গাল?"

শত টুকরা হ'য়ে গেছিস—আমার সোণার আয়না।
আর কিরে এক হবিনা, একি তোর বায়ণা
তোরা কিসের কাঙ্গাল কিসের কাঙ্গাল ?"
কে আস্‌ছে, তোরা ছাড়া, হেথায় কেরাণী হ'তে
গুজরাটী হিন্দুস্থানী শিখ শতে শতে
তোরা কিসের কাঙ্গাল কিসের কাঙ্গাল ?"
তারা তো ধনী হচ্ছে, ঘুর্‌ছে গাঁয় গাঁয়
ম্যালেরিয়া বিসূচিকা তারা না ডরায়,
তোরা কিসের কাঙ্গাল কিসের কাঙ্গাল ?"
যা-রে দেশে যা-রে ঘরে, যারে সোণার ক্ষেতে
অন্নপূর্ণা মা যেখানে আছেন আঁচল পেতে
তোরা কিসের কাঙ্গাল কিসের কাঙ্গাল ?"

গান আস্তে আস্তে শ্রোতৃবর্গের চিত্তে একটা উৎসাহের সঞ্চার ক'রে মিলিয়ে গেল।

সভাপতি মহাশয় উঠে বল্লেন,

"আজ এই শাঁখ বাজিয়ে মেয়েরা ঘরে ঢুক্‌লেন,—এই ঘর আপনাদের চোখে দেব-মন্দিরের মত পবিত্র হউক। আপনারা এক হউন, জয়ী হউন, এই আমার প্রার্থনা।

এমন একটা দিন যে আস্‌বে—তা আমি মনেও করতে পারি নি। আমরা তো এ পর্যান্ত গড়্‌বার কোন ক্ষমতাই দেখাই নি। ভাঙ্গবার জন্ত হাতুড়ি নিয়ে যাত্রা করেছিলুম। জাতিভেদ, দেবভক্তি, পিতামাতার প্রতি

শ্রদ্ধা, আতিথ্য প্রভৃতি যেখানে যা ছিল, এককালে যে সকল সদ্‌গুণের উপর আমাদের সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল—তা সব ভাঙ্গছি। সেগুলি ভেঙ্গে ভাল করেছি, কি মন্দ করেছি, সে বিচার এখানে করব না। কিন্তু সবইতো ভাঙ্গ্‌ছি, শুধু এই পল্লীখানি গড়েছি। আলেকজন্দ্রার পাঠাগার যারা ধ্বংস করেছিল, তাদেরই বা স্পর্দ্ধা করবার কি আছে? একটা হাতুড়ি নিয়ে তাজমহাল ভাঙ্গা যায়, একটা দেশলাইয়ের কাটি দিয়ে বিশ্ব জ্বালানো যায়—তাতে গৌরব কর্‌বার কি আছে? কিন্তু এই যে পল্লীটুকু গড়া হ'ল—এই কাজের মত কাজ হ'ল। যেমন সাঁঝে যখন একটি তারা উঠে, তখন দেখ্‌তে দেখ্‌তে শত শত সহস্র সহস্র তারা উঠে যায়—আমি নিশ্চয় বুঝেছি—এই পল্লীটি সেই প্রথম তারাটির মত একটি শুভ-সূচনা। এখন এমন আরও ঢের হবে। যাঁরা এসেছেন তাদের ভাল লাগা দেখে, তাঁদের সকৌতুক দৃষ্টি ও অনুরাগ দেখে আমি বুঝেছি, এটি একটি হ'লেও বহুর পূর্ব্বদূত।

এই পল্লী লক্ষ্মী যাঁর ভুজাশ্রয়ে গড়ে উঠেছেন, সেই সর্ব্বজন মান্য, অশেষ শ্রদ্ধাভাজন, একান্ত নিঃস্বার্থ, অক্লান্ত কর্ম্মী মহাপ্রাণ যোগেশচন্দ্র রায়কে আপনারা অভিনন্দিত করুন।"

এই বলে তিনি চেয়ার থেকে উঠে একটা বড় রকমের বেলফুলের গড়ে যোগেশ বাবুর গলায় পরিয়ে দিলেন, চারিদিক হতে আনন্দধ্বনির সঙ্গে ধন্যবাদ পড়্‌তে লাগল।

দূরে একটা চিকের আড়াল থেকে তখন কেউ দেখতে পেতেন,—শতদলের মুখখানি শতদলের মতই গৌরবে প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে এবং তাঁর চোখ থেকে বিন্দু বিন্দু অশ্রু বেয়ে পড়্‌ছে।

যোগেশবাবু উঠে বল্লেন, "সভাপতি মহাশয়ের এতটা অনুরাগ ও সহযোগ না পেলে যে আমরা আদর্শ-পল্লী এত শীঘ্র গঠন করতে পারতুম—তা মনে

হয় না। মার্টিন কোম্পানীকেও আমরা প্রাণের সহিত ধন্যবাদ দিচ্ছি, এটা দেশের কাজ মনে করে স্যার রাজেন্দ্র আমাদিগকে অনেক সাহায্য করেছেন। আর আমার পার্শ্বে যে এই ভ্রাতৃকল্প কেদারবাবু ব'সে আছেন—এঁর গুণ আমি এক মুখে বলে উঠতে পারব না। ইনি কথা খুব কমই বলেন, কিন্তু কাজ এত বেশী করেন, যে কথা বলার প্রয়োজন হয় না। সেই কাজ গুলিই সাক্ষীর মত হয় এঁর নিজের সমস্ত বক্তব্য—ইনি কতখানি পরিশ্রম করেছেন—তা' বলে দেয়। এমন একটা ব্যাপার না হ'লে আমরা কেদারবাবুর মতন লোক চিন্‌তে পারতুম না। আমাদের দেশে অপূর্ব্ব কর্ম্মী ও ত্যাগী মহাজনেরা লোক-উপেক্ষায় ডুবে আছেন। কেহ যদি বাস্তবিক কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চান, তবে এদেশে কর্ম্মীর অভাব হ'বে বলে আমার মনে হয় না। এই যে ছবির মতন বাড়ীগুলি, এই যে পয়ঃপ্রণালীগুলি যা এত সুন্দর হয়েছে, যাতে করে বৃষ্টির পরে পাখী যেমন তার পক্ষপুট ঝেড়ে ফেলে সমস্ত জলবিন্দু হ'তে মুক্ত হয়ে দাঁড়ায়—বর্ষা বা জলপাতের পরে একদণ্ডের মধ্যে গ্রামখানি তেমনই সুন্দর খট্‌খটে হয়ে উঠে—এই যে বিজলীবাতির যন্ত্রটি—এ সমস্তই কেদারবাবুর মাথা থেকে হয়েছে। এই মাথার কয়েকগাছি চুল মাত্র পেকেছে, আমরা আশা করি এই ঘন চুলগুলি যেপর্য্যন্ত সবগুলি ধব্‌ধবে সাদা হয়ে বক-পক্ষের মত না হবে, তত দিন পর্য্যন্ত আমরা ইঁহাকে আমাদের কাজের মধ্যে সর্ব্বদা পাব। আর কাজ তো আমাদের সুরু হয়েছে মাত্র। এই দেখুন, [illegible]গুলি—এই পত্রগুলি অতি দীর্ঘ—ইহা এখানে পড়্‌বার সময় নেই; তবে মোটামুটি খপর বলে যাচ্ছি! উলো হতে ধনেশচরণ বাগ্‌চি লিখ্‌ছেন, সেখানে প্রায় দুই হাজার বিঘা জমি নামমাত্র দামে পাওয়া গিয়েছে, ধনেশবাবু পল্লীসঙ্ঘ গঠন করে চিঠি লিখেছেন, তাদের কাজ শিখ্‌তে আমাদের একজনকে তথায় যেতে। বারুইপুর ছেড়ে ফলতার ওদিকে রত্নেশ্বর বাড়ুয্যে এক

জমিদারের নিকট অনেক জমি অতি অল্পমূল্যে পেয়েছেন, সেখানে সমুদ্রের জল জমি ভাসিয়ে নেয়, তার জন্য ভেরি বাঁধতে হবে ; তা' তিনি অনেকটা করেছেন। গত বছর জল উঠে নি, এখন তাঁরা প্রায় ৭০ জন লোক দস্তখত করে পল্লীগঠনের জন্য আমাদের কাছে আবেদন করেছেন। ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ে, এখান থেকে বেশী দূরে নয়—শ্যামনগর ষ্টেসনের কাছেও জমি সংগৃহীত হয়েছে। এইরূপে সাঁকরাইল, বাউড়িয়া প্রভৃতি আরও পাঁচ জায়গা থেকে চিঠি পেয়েছি। বোধ হয় বছর না ফিরতে ফিরতে আর আট দশখানি পল্লী স্থাপিত হয়ে যাবে। আমরা সম্পূর্ণ নূতন আদর্শে গ্রাম গ'ড়ে ফেলে ম্যালেরিয়া তাড়াব। কর্ম্মী কেদারবাবু আর আমাদের পল্লীবাসী প্রিয় যুবক নারায়ণ রায় মিলের সাহেবদের বস্তিগুলি ভাল করে দেখে এসেছেন। কিসে ম্যালেরিয়া না ঢোকে, তাদের বস্তিগুলির জল নিকাশের ব্যবস্থা—এবং অপরাপর জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁরা খুব সহৃদয়তার সহিত যত্ন ক'রে দেখিয়েছেন।

আমরা আদর্শপল্লী কতকগুলি গঠিত হ'লে,—নিজেরা ডিষ্ট্রিক্ট গঠন কর্‌ব। আমাদের দোকান পশার সমবায়ে হবে। এমন কি আমরা তিন চার বছর পরে নিজেদের রেল ও ষ্টিমলঞ্চের ব্যবস্থা করতে পারব। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবে নহে, শুধু আমাদের ব্যবহারের জন্য। তাহাতে ঠোকাঠুকি হওয়ার সম্ভাবনা থাক্‌বে না।”

তার পরে হিসাব নিকাশের কথা উঠলে দেখা গেল, একশত লোকের মধ্যে মাত্র দুইজন আংশিক ভাবে সমবায়-ব্যাঙ্কের সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

এর পরে পল্লীবাসীরা যে কি আনন্দে একত্র খাওয়া দাওয়া করেছিলেন, তা' বলার চেষ্টা কর্‌ব না। সেখানে কোন দামী খাওয়ার কিছুই ছিল না, সেই সাবেকী ধরণের খাওয়া,—তা যে কত মধুর ও উপাদেয় লাগ্‌ল এবং

তদুপলক্ষে যে পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন কিরূপ দৃঢ়ীভূত হ'ল, তা ব'লে শেষ করা যায় না।

২৫

বিপিন আদর্শ-পল্লী হ'তে নবদ্বীপে চলে এল। তার পিতা মাতা ও ভগিনীরা একমাস তার সঙ্গে তেনাই দর্শন ক'রে "যোগেশকুঞ্জে" কাটাবেন, এই সঙ্কল্প ক'রে সঙ্ঘ হতে ছুটি নিয়ে এলেন। তেনাইবাসী তাঁদের নিকট জ্ঞাতি ভাইপো রাজকুমার রায় সদ্যঃ বিবাহিত,—পিতৃমাতৃহীন, তার বাস-ভূমিটী পর্য্যন্ত পিতৃঋণে নিলাম হয়ে গেছিল। রাজকুমার সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী। শতদল তাকে নিজেদের বাড়ীঘর লিখে দিলেন। "আমার বাগানের আয় এখন মাসিক ১৫০৲ টাকায় দাঁড়িয়েছে, তুমি আয় বৃদ্ধি করে স্ত্রী নিয়ে বাস ক'র, তবু আমার শ্বশুরের ভিটায় সাঁঝের বাতিটি জ্বলবে। আমরা আদর্শ-পল্লীতে গিয়ে থাকব,—কিন্তু এই পল্লী থেকে আমি স্বাবলম্বন ও স্বামীর মর্য্যাদার মূল্য বুঝতে পেরিছি, এই ভিটা আমাকে অনেক তত্ত্ব শিখিয়েছে, যাতে আমার জীবনের দীপ হোমানলের মত আমার নিকট পবিত্র ব'লে বোধ হয়েছে। আমি স্বামী ছাড়া থাকতে পারব না, যেহেতু প্রতি পদে আমার তাঁকে সহায়তা করতে হবে। আমরা মাঝে মাঝে এসে তোমাদের দেখে যাব।"

সাশ্রুনেত্রে রাজকুমার এই দান গ্রহণ করলে। কেষ্টাবাগ্দীকে নানারূপ বকসিস দিয়ে তুষ্ট ক'রে, বাড়ী সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করে এবং একদিন তেনাই-বাসী আত্মীয় স্বজন ও দুঃখী কাঙ্গালীকে খাইয়ে, যোগেশবাবু সপরিবারে নদীয়ায় উপস্থিত হ'লেন। সেথানে যেয়ে যা দেখলেন, তাতে তিনি আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। কত লোকে যে বিপিনের প্রশংসা করতে লাগল, এবং ২।৪ ঘন্টার মধ্যে তাঁর ঠাকুরের প্রণামী বাবদ যে কত দান

আসতে লাগল, যে তিনি বহু চেষ্টায় যে অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন নি, সেরূপ অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষমতা বিপিনের মুঠোর ভিতর, ইহা বুঝতে পারলেন। অথচ বিপিন অর্থ চায় না, সে তো কীর্ত্তন নিয়ে ব্যস্ত, কাঙ্গালী ভোজন নিয়ে ব্যস্ত। রাসের সময় বহু টাকা আমদানী হয়েছিল, তাকে না দেখতে পেয়ে বহু যাত্রী নিরাশ হয়ে গেছে, মফঃস্বলে রটে গেছে—শুক প্রহ্লাদ কি তেমন আর কেউ নদিয়ায় আবার আবির্ভূত হয়েছেন। এই জনশ্রুতি বিপিন যতই ঠেকিয়ে রেখে তার নাম ধাম সম্বলিত পরিচয় দিচ্ছে এবং বিনয় ও দৈন্য জানিয়ে সকলের পায় ধরেছে, ততই তার দেবত্বের খ্যাতি বেড়ে যাচ্ছে। যোগেশবাবু বুঝলেন, যে লক্ষ্মীকে চায় তার প্রতি তিনি অনেক সময় ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করে যে তাঁকে চায় না তার পিছু পিছু ঘোরেন। এবং তিনি আরও দেখলেন ভারতবর্ষের লোক প্রকৃত পক্ষে কি চায়। তারা নিশ্চয়ই দেব-দর্শন করেছিল, এই জন্য মানুষের মধ্যে তারা এত আগ্রহে ঠাকুর খুঁজে বেড়ায়। তাদের আরাধ্য অনেক ঠাকুর ভণ্ড বলে ধরা পড়ে যায়, তথাপি তাদের এই ঠাকুর-খোঁজা রোগের কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না। এ দেশে এখনও সাচ্চা জিনিষ আছে, তাই মেকি পর্য্যন্ত চলে যাচ্ছে। যোগেশবাবু ভাবলেন, কালে হয় ত এই নদীয়া জগতের তীর্থ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাঁর প্রাণ-প্রিয় বিপিনের মধ্যে যে কিছু ঠাকুরের ভাব আছে, তা শিশুকাল হ'তে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, এজন্য তাকে দেখিয়ে একদা তিনি বন্ধুবান্ধবকে বলতেন, "এটি হচ্ছে আমার বালগোপাল।" বিপিন একটা প্রেস কেনবার চেষ্টায় ছিল। সে রাত্রি জেগে বৈষ্ণবধর্ম্মের পুস্তিকা লিখত—তা' এত মধুর হ'ত যে লোকে তা পড়ে এসে তার পায় গড়াগড়ি দিতে যে'ত। "আমি আপনাদের ছেলে" বলে দাঁতে জিভ কেটে সে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা করত।

কৃষ্ণনগর হতে সুহাসিনীকে নিয়ে রমেশবাবু এসেছেন। তিনি একটু

নিরালা পেয়ে যোগেশবাবুকে বল্লেন, "একটা কথা বলতে চাই, ভয় হয়।"

যোগেশ। "আপনি আমার ছেলেকে বিপদের সময় স্থান দিয়ে রক্ষা করেছেন। আপনার ইচ্ছা আমার পক্ষে আদেশ। এ ঋণ কি শোধ হবে কোন কালে? আপনি আমায় কি বল্‌বেন, ছোট ভাইকে বড় ভাই যেমন জোর করে বলে, তেমনই জোরের সঙ্গে বলুন।"

রমেশ। "আপনারা তেনাইর 'গণ', অতি প্রসিদ্ধ বংশ, আর আমি চাটগেঁয়ে বৈদ্য, দেশে অবশ্য আমার মান সম্ভ্রম আছে। কিন্তু আপনাদের কাছে 'বৈদ্য' ব'লে পরিচয় দিতেই আমার সাহস হয় না, কুটুম্বিতার কথা ত বহুদূরে। তথাপি যদি সাহস দেন তবে একটা দুরাশার কথা বল্‌তে চাই। আমার মেয়েটিই ত এইখানে, আপনি তাকে দেখে প্রথমেই বলেছিলেন "বা! কি অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে! তুমি কোন রাজার ঘর অলঙ্কৃত কর্‌বে লক্ষ্মী আমার! এই বলে আপনি তাকে টেনে কাছে বসিয়েছিলেন; এতে আমার লোভ ও সাহস ভয়ানক বেড়ে গেছে। অবশ্য আমাদের সমাজে বিপিনের বিয়ে দিলে আপনার উপর সামাজিক শাসন চল্‌তে পারে, আমি অতটা সাহস ক'রে প্রস্তাব করি কি ক'রে?"

যোগেশ। "কিছুমাত্র দুঃসাহস নহে। আমি এইরূপ সামাজিক আত্মীয়তার পক্ষপাতী। বৈদ্য বামুন হউন, আর যাই হউন তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছিনা। শ্যামাচরণ সেন আপনাদের সমাজকে এক আচারের দিকে টেনে এনে তাঁদের মর্য্যাদা বাড়াবার জন্য বিলক্ষণ চেষ্টা পাচ্ছেন। আমাদের এখন এক হতে হ'বে, নতুবা মুষ্টিমেয় বৈদ্য সমাজ টিক্‌বে না। আমরা বিদ্যাবুদ্ধি ও অর্থবলেও বড় হ'তে পারি। কিন্তু সংখ্যায় যে আমরা এক মুঠো, আমাদের একাচারী হ'য়ে এক হ'তে হবে, নতুবা আমরা মর্‌ব।

"দেখুন, আমরা সমস্ত ভারতবর্ষকে এক কর্‌তে চাচ্ছি। কংগ্রেসের প্যাণ্ডালে দাঁড়িয়ে বোম্বে, পার্শী, মুসলমান, বাঙ্গালী সকলে মিলে 'ভাই' 'ভাই' বলে চীৎকার কচ্ছি, অথচ এই ঐক্যের প্রথম ভাগ এমন কি 'অ, আ', পর্য্যন্ত আমরা অভ্যাস করতে পারি নাই। এক বাঙ্গালী জাতি শত শত শাখায় বিচ্ছিন্ন, এঁরা ওঁকে ছোঁবেন না, এরা ওঁকে ঈর্ষা করবেন এবং কেউ বড় হ'তে চাই আগে জনক ঋষি হও—তার পরে বোঝা যাবে—ইত্যাদি কথার চা'ল মেরে নিজেরা অপরকে পায়ের তলায় রাখ্‌বেন। কিন্তু এই এক বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ধরুন, ব্রাহ্মণ কত রকমারি আছেন, রাঢ়ী আছেন, বারেন্দ্র আছেন, বৈদিক আছেন, আচার্য্য আছেন, বর্ণ-ব্রাহ্মণ আছেন, এঁরা অনেক সময় পরস্পরের হাতে খাবেন না, বিবাহাদি তো দূরের কথা। কায়স্থ প্রভৃতি জাতিরও মধ্যে সেইরূপ ভাগ আছে। কিন্তু যাঁরা সংখ্যায় বড়, তাঁরা এইরূপ নিতান্ত অন্যায় ভেদ-বুদ্ধির প্রশ্রয় দিয়েও হয়ত কতক দিন টিকে থাক্‌তে পারেন, বৈদ্যের মত সংখ্যায় ক্ষুদ্র জাতি যদি এইরূপ ঠাঁই-ঠাঁই হয়ে আত্মম্ভরিতার ব্রহ্মডাঙ্গায় বসে থাকেন, তবে তাদের মর্‌তে বেশী দেরী হবে না। এই জন্য যাঁরা আচার-সাম্য গ্রহণ করেছেন, আমি তাঁদের পক্ষপাতী। এই আচার-সাম্য হ'লে সামাজিক আত্মীয়তার কোন বাধাই হবে না। চাটগেঁয়ে বৈদ্য যদি অপর জাতীয় লোকদের সঙ্গে কতক কতক মিশে গিয়া থাকেন, তবে তারা আবার যাতে বৈদ্য সমাজে মিশতে পারেন, তার চেষ্টা করবেন। এতে শুধু তাদের লাভ নহে, সমস্ত বৈদ্য সমাজের বল-সঞ্চয় ও পুষ্টি লাভ হবে। প্রথম প্রথম আমাদের সমাজ থেকে যারা আপনাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে যাবেন, তারা একটু নিগৃহীত হবেন, কিন্তু নেহাৎ সব দিক বজায় রেখে সংস্কার কাজে চলে না। সংস্কারকের মাথায় কোন কালেই পুষ্পবৃষ্টি হয়ে থাকে না। চাটগাঁ যখন আচারে ব্যবহারে এই মিলনের দিকে যোগ্য

হচ্ছেন, তাতে আমার এই বিবাহে কোনই আপত্তি নাই। আমি পুচ্ছগ্রাহিতা ছেড়ে দিয়েছি। বৈদ্যের ভিন্ন ভিন্ন শাখা যদি এক হ'তে পারে, বামুনেরা যদি তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা এক করতে পারেন, তবে যে বড় ঐক্যের স্বপ্ন এখন নেতারা দেখ্ছেন, তা কার্য্যে পরিণত করবার যোগ্যতা আমরা লাভ করব। একবারেই সাগর লঙ্ঘনের চেষ্টা না করে, ডোবা নালা, খাল, বিল কি ক'রে পার হ'তে হবে—তাই শিখ্তে হবে।

"আমার মত আপনাকে জানালুম, কিন্তু বিপিন কি বিয়ে করবে? আমি তাকে যতটা জেনেছি, তাতে আমার ছেলেটির তো পূরো মাত্রায় সন্ন্যাসীর ভাব! তার যদি মত করাতে পারেন, আমার কোন আপত্তি নাই, আমার মত যা হ'বে, বিপিনের মা তাতে অমত করবেন না।"

রমেশ। "আমি যে কত খুসী হলুম, তা বল্‌তে পারি না। বিপিন আর সুহাসিনী এরা এত গভীরভাবে পরস্পরের প্রতি অনুরাগী যে একে অপরকে চোখে হারায়। আমার স্ত্রী তো বলেন, "সুহাসিনীকে বিপিন নিজের মনের মতন ক'রে গড়ে তুলেছে।"

যোগেশ। "তা হ'লে আমাদিগের দিক্ থেকে কোন আপত্তি উঠ্‌বে না, একবার তাদের মত নিন্।"

নিতান্ত হৃষ্টচিত্তে রমেশবাবু বিপিনের কাছে গিয়া প্রস্তাব করিলেন,— "সামাজিক গোলযোগের জন্য এ বিয়ে কিছুতেই হ'তে পারবে না, রমার ও আমার এই আশঙ্কাই বরাবর ছিল। কিন্তু তোমার বাপ দেবতুল্য, তিনি কতটা উদার তা আজ বুঝ্তে পেরেছি। এই কার্য্যে স্বীকৃত হয়ে তিনি অনেক সামাজিক বিড়ম্বনা ইচ্ছা করে কাঁধে নিচ্ছেন, কিন্তু তিনি যেমনই উদার তেমনই সাহসী। যা' ভাল মনে করেন, তা করতে তাঁর দ্বিধা মাত্র নেই, সে কার্য্যের ফলাফল যা হউক না কেন।"

বিপিন কিছুকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বল্লে "জ্যাঠাম'শায়, বলেন কি? সুহাসিনীর সঙ্গে আমার বে'—এ হ'তেই পারে না। আমি বিয়ে করব না—এ কথা জোর করে বলছি না, কারণ আমার নিজের মত বলে কিছু নেই। তিনি যখন যে দিকে নেবেন, সে দিকে যাব। এখন তো তিনি বিয়ে করার প্রবৃত্তি আমায় দেন নি।"

রমেশ। "তা হ'লে তো মেয়েটার জীবন একবারে মাটী হয়ে যাবে দেখ্‌ছি! সে তো তোমার উপর অনুরাগী—তার গতি কি হ'বে?"

বিপিন। "সে কি? সুহাসিনী আমায় বিয়ে করতে চায়? এ তো আমি ভাব্‌তেই পারি না। আমার জন্য তার জীবন মাটী হবে? সে কি এই বলেছে? তবে তাকে আমি ঠেলে ফেলব কি ক'রে? তার মনে কষ্ট দেওয়া তো হতে পারে না—ভগবান আমায় ক্ষমা করবেন না, তা হ'লে। সে কি বলেছে—কি আভাসে বুঝিয়েছে যে আমার সঙ্গে বে' না হলে তার জীবনটা মাটী হবে?"

রমেশ। "সে কথা কি সে মুখ ফুটে বল্‌তে পারে? তবে রমা তো সব বুঝতে পারেন, তিনি বল্‌ছেন সুহাস তোমার সঙ্গে বে' না হ'লে জীবনে সুখী হবে না।"

বিপিন। "আমার মনে হয়, মা হ'য়ে তিনি মেয়েকে ভুল বুঝেছেন। অন্ততঃ আমি তাকে যতটা বুঝেছি, তাতে তো সে রকম কিছু মনে হয় না।"

রমেশ। "আচ্ছা আমি এবিষয়টা ভাল ক'রে জেনে এসে তোমায় বল্‌ছি।"

সেই দিন সন্ধ্যাকালে রমা সুহাসের চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে কথাটা পাড়্‌লেন। "উনি তো তোর সঙ্গে বিপিনের বে'র কথা যোগেশবাবুর কাছে প্রস্তাব করেছেন, তুই তো চৌদ্দ বছরে পা দিয়েছিস্‌, এখন তো

আর খুঁকিটি নইস্। তোদের মত হ'লে যোগেশবাবুর অমত হবে না।"

সুহাসিনী মাথা নীচু করে বসে ছিল, মা চুল আচঁড়াচ্ছিলেন। এই কথা শুনে ঘাড় বাঁকিয়ে আশ্চর্য্য ও বিরক্তির সঙ্গে বল্লে—"সে কি কথা! বাবা খুড় ম'শায়কে এমন কথা বল্‌তে গেলেন, কি করে? আমায় যে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে।"

রমা। "তবে কি তুই বিপিনের সঙ্গে বে হতে গর্‌রাজি? এত অনুরাগ, তাকে দুদিন না দেখলে পাগল হ'য়ে যাস্।"

সুহাসিনী। "সত্যি তাকে আমি যেরূপ ভালবাসি এমন কাউকে না। কিন্তু তাই বলে বে'র কথা তুলছ। আমি যে লজ্জায় মরে যাচ্ছি। তিনি আমার গুরু। আমি তাঁর আশ্রমে চিরদিন থাক্‌ব। কিন্তু তার সঙ্গে আমার বে হবার কথা মুখে এন না—ও শোনা আমার পাপ!"

রমা। "মেয়ে বলে কি? আজন্ম বিপিনের আশ্রমে থাক্‌বেন, অথচ বে করবেন না। লোকে বল্‌বে কি? লজ্জায় তো আমাদেরই মাথা কাটা যাবে।"

সুহাস। "গুরুর আশ্রমে থাক্‌ব, তাতে তোমাদের মাথা কাটা যাবে কেন? যদি লোকে ভুল বুঝে কিছু বলে, কিন্তু, তা বেশী দিন বল্‌বে না।"

সেদিন এই পর্য্যন্তই হয়ে রইল। তারপর রমেশবাবু ও রমা বুঝ্‌তে পারলেন, তাদের মেয়ে ও বিপিন আত্মার জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়,—তারা দৈহিক প্রভাবের ঊর্দ্ধে। কিন্তু সামাজিক হিসাবে গোলযোগ হ'তে পারে, এই আশঙ্কায় অনেক দিন কথা কাটাকাটি, উপদেশ বর্ষণ ইত্যাদি হ'তে লাগল। কিন্তু সুসাসিনীর মত কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হ'ল না।

এদিকে বিপিন এক দিন সর্ব্বসমক্ষে বল্লে—"এই সুহাস আমার ধর্ম্মজীবনের ভগিনী—আমরা উভয়ে তারই পাদপদ্মে আত্মজীবন উৎসর্গ

করেছি। আমি ইহাঁকে আশ্রমেই রাখব, যদি ইহাঁর ইচ্ছা হয় এবং এর পিতামাতার অমত না হয়।"

যদিও প্রথম প্রথম কিছু কানাঘুষো, দুষ্ট লোকের নিন্দাবাদ হয়েছিল—তথাপি শিলাখণ্ড উর্দ্ধে ছুঁড়লে তা কতকাল বায়ুর উপর থাকতে পারে? জলের তিলক কপালে আঁকলে কতক্ষণ থাকে? মিথ্যা কতদিন তিষ্ঠিতে পারে। যাদের কিছু দ্বিধা ছিল, তারাও সুহাসিনীর তেজস্বিনী মূর্ত্তি এবং ভক্তির মূর্ত্তিময়ী মহিমা দেখে কোন অন্যায় কথা ভেবেছেন,—মনে হয়ে লজ্জা পেতেন। কালে লোকে বুঝ্‌ল—এই তরুণ ও তরুণী দেব ও দেবীর প্রকৃতি নিয়ে এসেছেন। এঁরা সংস্কারের গণ্ডীর ভিতর থাকবার লোক নন, সংসারের মাপকাটি দিয়ে এদের ওজন করা যায় না। সকলে শেষে যেমন বিপিনকে, তেমনই সুহাসিনীকে শ্রদ্ধা করতে লাগলো। তাঁরা দুইজনে নবদ্বীপে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যে যুগান্তর উপস্থিত করলেন, তার ঢেউ দূর দূরান্তরে গিয়ে সাড়া পেতে লাগ্‌ল। কে কি করে বুঝাল—জানা গেল না, পুষ্পকুঞ্জে মধুপের নিমন্ত্রণের ন্যায়, শর্করার বিন্দুতে পিপীলিকার ডাকের ন্যায়—চারিদিক লোকজন "যোগেশকুঞ্জে" এসে তাঁদের কথাবার্ত্তা শুনে ধন্য হ'তে লাগ্‌ল। অনেক সময় লোক স্নানাহার ভুলে এদের কথা শুনেছে—সে অমৃত সিন্ধু যেন ফুরোতে চায় না, তাতে রোগী রোগের যন্ত্রণা ভুলেছে, শোকার্ত্তের শোক অপনোদন হয়েছে এবং ধর্ম্মতত্ত্বান্বেষী অমৃতের পথ চিনতে পেরেছে।

রজনী চৌধুরী রাজীব, চারু ও লবঙ্গকে নিয়ে বৃন্দাবন হ'তে এসেছেন ; কলিকাতা হ'তে সুরেশ ও নরেশ এসেছে। রঘুপুরের লোকেরা বল্‌ছে, "তাই তো এমন লক্ষ্মী বউ, মুখ দিয়ে কথাটি নেই,—আমরা বলাবলি করেছি, যে বউ হবি তো এমনই হ'স, সে বউয়ের দুর্নাম শুনে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেছলুম"। বুড় বামুনদি বল্লে, বড়বাবু যেমন বাড়াবাড়ি কচ্ছিলেন, বউ মা তা পালিয়ে বেঁচেছিলেন।

রাজীব নিজে অনুতপ্ত হয়ে তাঁর পিতাকে দিদির সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলেছিলেন। শতদল আর পিত্রালয়ে আসবেন না—এইরূপ প্রতিজ্ঞা ক'রে চ'লে গেছেন, শুনে রজনী চৌধুরী খুব দুঃখিত হ'য়েছিলেন। স্বভাবতঃ মেয়েটি অভিমানী, তার উপরে যা ঘা' পেয়েছে, সে তো আর এ পথ মাড়াবে না। ইহা বুঝে তিনি স্বয়ং আদর্শ-পল্লীতে এলেন, সঙ্গে সুরেশ, নরেশ আর চারু এল।

শতদল বাবাকে পেয়ে ও ছোট দুটি ভাইকে দেখে যে কত সুখী হ'ল, তা বল্‌বার নয়। আজ যোগেশের পল্লীভবনটি আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠ্‌ল। সুরেশ, নরেশ—একজন থার্ড ইয়ারে, একজন ফোর্থ ইয়ারে পড়ে—তারা তো পল্লীর সমবায়-দোকান-পশার-স্কুল প্রভৃতি দেখে আনন্দে নেচে উঠ্‌ল। রোজই প্রায় সমিতির বৈঠক বস্‌ছে, আজ স্বাস্থ্য-শাখা কাল শিক্ষা-শাখা—এইরূপ কোন না কোন শাখা-সভার অধিবেশন হচ্ছে, গ্রামখানির সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য এঁরা উঠে পড়ে লেগেছেন—সে কি উৎসাহ এবং কর্ম্মঠতা!

চারু বল্লে, তার বিস্তৃত জমিদারী আছে সে দেশে গিয়ে এইরূপ পল্লী তৈরী করার কাজে লেগে যাবে। এইরূপ আর বিশখানি পল্লী বঙ্গে

গঠিত হ'লে যে এ দেশ বৈকুণ্ঠ-নিবাস হ'বে। সাহেবেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে জগতের সর্ব্বত্র যে অশান্তির সৃষ্টি করেছেন, এ যেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত, এই পল্লীর ছায়ায় একটা জিনিষ যেন বিশেষরূপে লক্ষ্য করা গেল—তাহা শান্তি।

সকলেই কর্ম্মঠ, সকলেই জ্ঞানের পথের পথিক, উন্নতির দিকে বদ্ধলক্ষ্য, কিন্তু কেউ জড় সভ্যতার পায়ে মাথা হেঁট করে বিলাসকে বরণ ক'রে নেন নি। ভারতীয় চিরন্তন আদর্শ রক্ষা ক'রে আশ্রমকে খুব বড় ক'রে, আদর্শকে সাংসারিকতা দ্বারা মলিন না করে,—যে উচ্চ শিক্ষা এবং পরহিত সম্বলিত—ভগবানের প্রতি নিবেদিত তপস্যার জীবন লাভ করা যায় তাহাই এঁদের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য দ্বারা তাঁরা ভুবন বিজয় করবেন, সেই অভিযানে তাঁরা নেবেছেন। পাঁচ ছয়টি বিলাতী সদাগর একত্র হ'য়ে কমিটি ক'রে যেমন জগৎ জয়ের সংকল্প ধীরে ধীরে পুষ্ট ক'রে তোলে, এই শান্তি ও জ্ঞানের অভিযান সেইরূপ ভাবে করতে হবে। অর্থ সঞ্চয় ও লোভের দ্বারা জগৎ জয়ের স্পৃহা তাঁহাদের নহে—জ্ঞানের দ্বারা জগতের চক্ষুরুন্মীলন করতে হবে, শান্তি দ্বারা জগতের ক্ষত বিক্ষত বক্ষ তাদের জুড়োতে হবে। এক সভায় যোগেশ বাবু বল্লেন, "আমরা যদি কখনও এরোপ্লান করতে পারি, তবে তাহা কোথায় কি গ্রাস করতে হ'বে, কোথাকার কোন শস্য এনে তথাকার লোকের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়ার চেষ্টার জন্য নহে, একদেশের সোনার খনি খুঁড়ে এনে অপর দেশকে ধনী করবার জন্য নহে, আমাদের এরোপ্লান যাবে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন-জনিত লোককষ্ট নিবারণ করতে। বিজ্ঞানকে য়ুরোপ যে রাক্ষসী মূর্ত্তিতে ভীতপ্রদ করে জগতের সম্মুখে এনেছে, আমরা সে মূর্ত্তিতে দেখতে চাই না। আমরা বিজ্ঞান-ভারতীর স্মিত আস্য ও বরপ্রদ হস্ত দেখাব। জড়শক্তির আবিষ্কার দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ হ'তে পারে, সেই কল্যাণ সাধনেই বিজ্ঞানের

সার্থকতা। এখন বিজ্ঞান গৃধ্ররূপ ধারণ ক'রে জগতের চতুর্দ্দিকে তীব্র চক্ষে তাকাচ্ছে—কোথা হ'তে পরমাংস-লোভ-তুষ্ট স্বীয় জগৎগ্রাসী ক্ষুধা মিটোবে। আমরা বিজ্ঞানাগার হ'তে এই গৃধ্রকে তাড়াব।"

চারু বি,-এস সি-পাস করেছিল—সে বল্লে "এই পুণ্য কার্য্যে আমি আমার জীবন নিয়োগ করলুম। আমাদের বিজলী বাতি জ্বলবে না—রাজপ্রাসাদ উজ্জ্বল ক'রে কুড়ে ঘরের আঁধারকে বাড়াতে, আমাদের রেল চল্‌বে না বড় মানুষের পায়ের ঠেলায় জনতাকে পিশে মারতে, অথবা পররাজ্য পরদ্রব্য ছলে বলে আত্মসাৎ করতে। আমরা বিজ্ঞানকে খাটাব, দুঃখীর কুড়ে ঘরে জ্ঞানের বাতি জ্বেলে তার হৃদয়ের অন্ধকারকে দূরীভূত করতে, কুসংস্কার তাড়াতে এবং মূঢ় সুবৃহৎ জনতার ভিতর প্রাণের স্পন্দন আন্‌তে, দুর্ভিক্ষ নিবারণ করতে, দুঃখীর নিকট দূরাগত প্রবাসী সন্তানের সংবাদ আন্‌তে। তারা যাতে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের গ্রাসে না পড়ে সেই চেষ্টা করতে, দেশী ভেষজের গুণাগুণ আবিষ্কার করে আয়ুর্ব্বেদকে পুনরায় জগতের বরেণ্য করতে! আমরা বৈদ্য, আমাদের জাতীয় ব্যবসা ছাড়্‌তে পারব না। আমরা জগতে যুদ্ধ বিগ্রহের অশান্তি আন্‌ব না, শান্তির বারিধারা বর্ষণ ক'রে জগতের দগ্ধ হৃদয় জুড়োব।"

যখন অতি উৎসাহে হাত নেড়ে চারু এই বক্তৃতা কর্‌ছিল, তখন যোগেশের বাড়ীর সকলে উৎসুক হয়ে তার কথা শুন্‌ছিলেন। চারু স্বভাবতঃ ধীর, শান্ত ও গম্ভীর, তার হৃদয়ে এতটা উত্তেজনা এসেছিল, দেখে যোগেশবাবু বুঝলেন, এই উৎসাহ ও প্রেরণার ফলে জলে শীলা ভাস্‌বে। চারুর মাথার চারদিকে তার ঘন কোঁকড়ান চুলগুলি তার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নড়্‌ছিল, সেগুলি অযত্ন রক্ষিত, তার মধ্যে কতকাল হয়েছে চিরুণী প'ড়ে নাই, অথচ সেগুলি নৈসর্গিকী শোভায় বড় সুশ্রী দেখাচ্ছিল, দুই একটি কোকঁড়ান চুল তার ছোট্ট কপালখানির উপর

ঝুঁকে পড়ে তার সুন্দর শ্যাম বর্ণ মুখখানিকে লাবণ্য-মণ্ডিত করে তুলেছিল, তার বর্ণটি ছিল—না গৌর না শ্যাম ; যেন আমটি সবে পাক ধরেছে, আর মধ্যে তারুণ্যের একটা স্পষ্ট শ্রী। যখন সে হাত নেড়ে, কোঁকড়ানো চুল দুলিয়ে কথা বলছিল, তখন তার অনতিদূরে দুইটি সতৃষ্ণ সুন্দর ও ডাগর চোখ তার দিকে অতি আগ্রহে ন্যস্ত ছিল। সুন্দরী তার প্রত্যেকটি কথা প্রাণ দিয়ে শুনছিল। চারু মাঝে মাঝে সেই প্রফুল্ল বন-লক্ষ্মীর মত মুখখানি দেখে যেন মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্ত নূতন প্রেরণা পাচ্ছিল, তার কথা আর থামছিল না।

সুন্দরী বল্লে "আপনি দেশে গিয়ে এই সকল কাজে হাত দেবেন, আপনার তো ভাই নাই, বোন নাই, মা বাপ কেউ নাই। আপনার বাড়ী ঘর দেখবে কে ?"

চারু। "যে কর্ম্মী তার কর্ম্মই মা বাপ, ভাই বোন। কর্ম্মই তাদের স্থান পূর্ণ করে। জগৎবাসী সকলেই আমার ভাই বোন। আমি যাদের হিত করতে লেগে যাব, তাদের মধ্যে থেকেই আমার মা, বাপ, ভাই, বোন জুটে যাবে।"

সুন্দরী। "আমি ভাবছিলুম, আপনি আমার মামা বাড়ীতেই থাকবেন। সেখানে বড় মামা আছেন, ছোট ও সেজো মামা আছেন, মামী আছেন, আপনার কোন কষ্টই হবে না। আপনাদের রঙ্গপুরের প্রকাণ্ড বাড়ীটা তো শুনছি একান্ত নির্জ্জন, কেউ নাই—যেন খা খা কচ্ছে। সেখানে একা থাকবেন কি ক'রে ?"

পাশের বাড়ীর তার সমবয়স্কা কিশোরী সেখানে ছিল। সে ব'লে উঠল "তুই যেয়ে ওঁর ঘরের অভাব পূরণ করগে না! এত বড়লোক, যিনি ইচ্ছা করলে দুই এক শ নফর দাসী রাখতে পারেন, তার একা থাকার ভয়ে তুই অস্থির হয়েছিস্—তুই যুগল তৈরী কর্ গে না!"

সুন্দরীর হৃদয়ের খুব দূরেও বোধ হয় এরূপ কোন সঙ্কেতের আভাষটি

পর্য্যন্ত ছিল না। তথাপি কিশোরীর কথায় তাঁর যেন মনের কি একটা অতি সন্তর্পিত ও অতি প্রচ্ছন্ন তারে আঘাত পড়ল। তার মুখখানি ছিল অতসী ফুলের মত গৌর, তাতে যেন কেউ সিন্দুর মাখিয়ে দিল, তা হয়ে উঠল রক্ত জবাটির মত।

সে বল্লে—"কিশোরী তুই কি যে বলিস্।" এই ব'লে লজ্জায় কুন্দ-কুসুমের মত আঙ্গুলগুলি দিয়ে মুখ ঢেকে সে মায়ের আঁচলে আশ্রয় নিল। গতিক এইরূপ দেখে চারু উঠে পড়ে বল্লেন, "ছেলেদের ব্যায়ামের পার্কটি দেখা হয় নি—একবারটি দেখে আসি।"

যোগেশ ও রজনী চৌধুরী দেখ্‌লেন, সুন্দরী এবং চারুর মধ্যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ এসেছে; তরুণদের মধ্যে এই ভাব যাঁরা লক্ষ্য করছেন, তাঁরা জানেন—তারা তা যত গোপন কর্‌তে চায়, তত বেশী ক'রে ধরা পড়ে। তারা সংসারানভিজ্ঞ, সরল, কৌটিল্যের পাঠ শেখে নি। সুতরাং তাদের সন্ত্রস্ত দৃষ্টি, পরস্পরের মুখের প্রতি চুরি ক'রে দৃষ্টিক্ষেপ—নির্জ্জনে একা ব'সে ব'সে ভাবা, অনর্থক পরস্পরকে এড়িয়া চল্‌বার চেষ্টায় আরও বেশী ক'রে ধরা দেওয়া—এগুলি সকলেই লক্ষ্য করেন। চারু বাড়ী ফির্‌লে সুন্দরীর শেলাই এলোমেলো হয়ে যেত, বইএর পাতা চোখের সামনে আছে অথচ একটি ছত্রও পড়া হ'ত না, কথায় কথায় লজ্জায় মুখ রাঙ্গা হওয়া ইত্যাদি নানা ভাব দেখে তাঁরা বুঝলেন, দুইজনে দুই জনের প্রতি অনুরাগী হয়েছে। একদিন রজনী চৌধুরী যোগেশকে বল্লেন—"এদের বিয়েটা শীঘ্র দিয়ে ফেলা যাউক।"

যোগেশ বল্লেন—"চারু বড় হয়েচে, একবার জিজ্ঞাসা করা যা'ক।"

রজনী চৌধুরী। "ওকে আবার মাথা মুণ্ডু কি জিজ্ঞাসা করব? আমার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে। আমি যা বলব, তাই কর্‌বে।"

যোগেশ। তথাপি বিয়ের কথা জীবনের সকলের চাইতে গুরুত্ব